বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক সপ্তম শ্রেণীর সহপাঠ্যরূপে অনুমোদিত

নোটিফিকেশন নং ৩ টি. বি. ৭·৭-৪৫

ছোটদের বিশ্বসাহিত্য

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ

মিত্র ও ঘোষ

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৪০

দ্বিতীয় সংস্করণ,জানুয়ারী ১৯৪২

তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৪৩

চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৪৫

পঞ্চম সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৪৬

ষষ্ঠ সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৪৮

সপ্তম সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৫০

অষ্টম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৫২

নবম সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৫৯

দশম সংস্করণ, জুন ১৯৬৪

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩৭-বি বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীপ্রবোধকুমার পাল কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘোষ, এম. এ., বি-টি

শ্রীচরণেষু

এই লেখকের লেখা

বাংলা ভাষার কথা, মঙ্গলগ্রহে বৈজ্ঞানিক, মোহনসিংহের ফাঁসী,
বিজ্ঞানের শেষবিস্ময়, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, ডেভিড কপারফিল্ড,
ট্রেজার আইল্যাণ্ড, পূর্ব্ববঙ্গের রূপকথা, ছোটদের পঞ্চতন্ত্র,
বাংলার টার্জ্জান, কিড্‌ন্যাপড্‌, বৈজ্ঞানিক অভিযান,
থ্রি মাস্কেটিয়ার্স, সেকাল ও একালের কাহিনী,
সুইস ফ্যামিলি রবিনসন, কেনিল্‌ওয়ার্থ,
বিশ্বনাট্যের গল্প

সূচীপত্র

ছোটদের বিশ্বসাহিত্য

প্রারম্ভিকা

বর্ত্তমান যুগে যাঁরা জন্মেছেন তাঁদের ভাগ্যবান বলা যেতে পারে। কারণ কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে যদি তাঁরা জন্মাতেন তাহ'লে সারা পৃথিবী তাঁদের কাছে অজ্ঞাত ও অখ্যাত রয়ে যেতো। নিজের দেশ ছাড়া জগৎ সম্বন্ধে আর কোন ধারণা বা জ্ঞান তাঁরা লাভ করতে পারতেন না।

আজ সমস্ত দুনিয়া আমাদের অধিকারের মধ্যে এসেছে—আমরা তাকে চিনি জানি এবং প্রতি মুহূর্ত্তে তার অস্তিত্বের প্রমাণ পাচ্ছি। বিশ্বের সঙ্গে এই যে আমাদের যোগসূত্র তা একমাত্র সম্ভব হয়েছে সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে।

সাহিত্য মানুষের জ্ঞান, বিদ্যা ও চিন্তাধারাকে মার্জ্জিত ও প্রসারিত করে ; কারণ সকল দেশের মনীষীরাই তাঁদের অন্তরের ভাবধারাকে অভিব্যক্ত করেন লেখনীর সাহায্যে। আর সেই সমস্ত লিখিত রচনার মধ্যে যেগুলি সুন্দর হ'য়ে ওঠে, যেগুলি আমাদের অন্তর স্পর্শ করে, সেইগুলিই হয় সাহিত্য।

তবে এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখা উচিত যে, এই লিখিত-সাহিত্য সৃষ্টি হবার আগেও পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এক শ্রেণীর লোক ছিলেন যাঁরা মুখে মুখে সুললিত সাহিত্য রচনা করতেন এবং তা মুখে মুখেই লোক-পরম্পরায় প্রচারিত হ'ত। দেশের লোকের

কাছ থেকে তাঁরা যথেষ্ট খ্যাতি ও সম্মান পেতেন। তবে তার একটা মস্ত অসুবিধে ছিল এই যে, লোকের মুখে মুখে তা অনেক সময়েই বিকৃত হ'য়ে উঠতো। স্রষ্টার আসল জিনিসটি পাওয়া যেতো না। তাই লিখিত-সাহিত্য এই সব মহৎ চিন্তাধারাকে চিরস্থায়ী ক্করে ব'লে তার, মূল্য এত বেশী।

যদিও এক দেশের ভাষার সঙ্গে অন্য দেশের ভাষার মিল নেই এবং প্রতি দেশের সাহিত্য স্বতন্ত্র ভাষায় লিখিত, তবুও বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যে আজ সব দেশের লোকের পরিচয় লাভ করবার সুযোগ ঘটেছে তা কেবলমাত্র নিজের মাতৃভাষার সাহায্যে সেই সব সাহিত্যকে অনুবাদ করার ফলে।

তাই আমাদের মাতৃভাষায় অর্থাৎ বাংলাভাষায় সেই বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে কিছু তোমাদের সংক্ষেপে বলবো।

বিশ্বসাহিত্যে অভিযান করতে হ'লে আমাদের বহু দেশ ভ্রমণ করতে হবে এবং বহু ভাষার মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। কারণ সাহিত্য হ'লো একটা জাতির মনোদর্পণ। তা ছাড়া তার মধ্যে আছে বহু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনার বিবরণ।

অবশ্য প্রথমেই ব'লে রাখা ভালো যে, আমরা এস্থলে শুধু সেই সব সাহিত্যেরই উল্লেখ করবো যার মধ্যে আছে বিশ্বজনীন আবেদন।

এখন হয়ত একটা কথা তোমাদের মনে হবে, সাহিত্যে বিশ্বজনীন আবেদন কি?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। তবে মোটামুটি এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, যে-সাহিত্যের মধ্যে বিশ্ববাসী তাদের অন্তরের যোগ খুঁজে পায় সেই সাহিত্যেই বিশ্বজনীন আবেদন আছে বলা যেতে পারে।

বেদ, বেদাঙ্গ ও পুরাণ

একট কথা শুনলে নিশ্চয়ই তোমরা গর্ব্ব অনুভব করবে—শুধু তোমরা কেন, বোধ হয় সমস্ত ভারতবাসী গর্ব্ব অনুভব করবে যে, সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তা প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের দেশেই, আমাদের ভারতবর্ষেরই তপোবনে—মুনিঋষিদের উদাত্ত কণ্ঠে! বৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে, সম্মুখে পবিত্র হোমানল-শিখা প্রজ্বালিত ক'রে দিব্যকান্তি, বল্কলধারী, জটাজূটাবলম্বী মুনিঋষিগণ স্নান ক'রে পুষ্প-চন্দনে সুশোভিত হ'য়ে দেবতাদের উদ্দেশে প্রথম যে মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, সেই হ'লো জগতের প্রথম সাহিত্য!

পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির সাহিত্যই আরম্ভ হয়েছে প্রায় ওইভাবে; স্তব থেকে মন্ত্র, তা থেকে অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ এবং তা থেকে বর্ত্তমান সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি তাই। এই হ'লো সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস।

সর্ব্বপ্রথম মানুষ যখন এই পৃথিবীর নিয়ম ও তার সুসম্বদ্ধ ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করল,—আলো, বাতাস, রোদ, জল প্রভৃতির উপকারিতা বুঝল তখন সে কৃতজ্ঞ হ'লো সেই সমস্ত মঙ্গলময় বিধানের যিনি নিয়ন্তা তাঁর কাছে। আবার যখন ভূমিকম্প, বজ্রপাত, রোগ, মৃত্যু প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করল তখন সে ভয়ে শিউরে উঠল। আর সেই কৃতজ্ঞতা ও ভয় থেকেই মানুষের কণ্ঠে যে স্তুতি উঠল বিধাতার উদ্দেশে—সূর্য্য, অগ্নি, বৃষ্টি প্রভৃতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়-বস্তু-রূপী বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে—তাই হ'লো প্রথম সাহিত্য। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ও অন্যান্য সব জাতির জীবনেই এই ব্যাপার ঘটেছে। কাজেই সব দেশের, সব জাতির মানুষের সাহিত্যেরই গোড়াপত্তন হয়েছে ওই স্তবে।

ঐতিহাসিকরা এ সম্বন্ধে প্রায় সকলেই একমত যে, পৃথিবীর বয়সের অন্ত নেই। বহুবার সৃষ্টির ও ধ্বংসের বিচিত্র লীলা এর উপর দিয়ে ঘটে গেছে। এবং এই এক-একটি ঘটনাকে সৃষ্টির বিভিন্ন Phase বা অধ্যায় বলে। হাজার হাজার বছর কেটে যায় এই এক-একটি অধ্যায়ের মধ্যে। এই রকম বহু অধ্যায় চলে যাবার পর আবার যখন সৃষ্টি শুরু হ'লো তখন প্রথম মনুষ্য-সভ্যতার বিকাশ হয় এশিয়াতেই।

মানুষ দেখা দেবারও বহুদিন পরে আবার একদল লোক মধ্য-এশিয়ায় দেখা দিল, যাদের বলা হয় আর্য্য। এই আর্য্য জাতিরাই অপেক্ষাকৃত সভ্য মানব অধ্যায়। আর্য্যদের যে শাখা তখন ভারতে প্রবেশ করল তারা ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে এসে মুগ্ধ হ'য়ে গেল। এবং সেদিন শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে সেই সর্ব্বকল্যাণময়ী প্রকৃতির উদ্দেশে যে স্তুতি উচ্চারণ করলে, তাই হ'লো পৃথিবীর প্রথম সাহিত্য।

এই আর্য্যগণের সর্ব্বপ্রাচীন ও সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মসাহিত্যের নাম হ'লো বেদ। এই বেদের আবার চারটি ভাগ—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব।

প্রত্যেক বেদের আবার তিনটি ক'রে উপবিভাগ আছে। যেমন, (১) সংহিতা ; (২) ব্রাহ্মণ ; (৩) সূত্র অথবা বেদাঙ্গ।

১। সংহিতা হ'লো স্তব, স্তুতি এবং যজ্ঞের মন্ত্র। এই সমস্ত বিষয়গুলিই প্রায় পদ্যে রচিত।

২। ব্রাহ্মণ গদ্যে লেখা। ব্রাহ্মণ অংশে যজ্ঞের বিধি ও অনুষ্ঠানের সার্থকতা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মন্তব্য ও আলোচনা আছে। অরণ্যবাসী ঋষি ও ব্রহ্মচারিগণের দার্শনিক চিন্তার ধারা এই সব গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। হিন্দুদের বিশ্বাস ভগবান স্বয়ং বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগ রচনা করেছেন। এ হ'লো স্বয়ং অনাদি ঈশ্বরের বিভূতি-স্বরূপ। সুতরাং তা অভ্রান্ত এবং বিচারবিতর্কের অতীত। এই জন্য বেদকে নিত্য, শাশ্বত ও অপৌরুষেয় বলা হয়।

আর আর্য্য-ঋষিগণ এই মন্ত্র সমুদয়কে জ্ঞাননেত্রে দেখেছিলেন। তাই তাঁদের 'দ্রষ্টা' বলা হয়।

৩। বেদাঙ্গ হ'লো বেদের অবশিষ্ট অংশ। এইগুলি মানুষের রচনা ব'লে স্বীকার করা হয়। বেদাঙ্গের সংখ্যা ছ'টি। কিন্তু ছ'টি ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকে বেদাঙ্গ বলা হয় না। ছ'টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ই ছয় বেদাঙ্গ নামে প্রখ্যাত। বৈদিক যাগযজ্ঞ বিধিমত করতে হ'লে এই ছ'টি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন হ'তো।

শিক্ষা (উচ্চারণ), ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত (শব্দের মূলার্থ-ব্যাখ্যা), জ্যোতিষ এবং কল্প (যাগযজ্ঞ বিধান)—এই ছ'টি হ'লো বেদাঙ্গ।

বেদ শুদ্ধরূপে পাঠ করবার জন্য প্রথম দু'টির আবশ্যক। তৃতীয় এবং চতুর্থটির প্রয়োজন তাদের অর্থ ভাল ক'রে বোঝবার জন্য এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠটি যাগযজ্ঞে বেদবিদ্যা প্রয়োগের জন্য তখনকার দিনে একান্ত আবশ্যক ছিল। এ ছাড়াও আর্য্যগণ আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, সঙ্গীত, কলা, স্থাপত্যবিদ্যা প্রভৃতি নানাবিধ লৌকিক সাহিত্যে অশেষ উন্নতি সাধন করেছিলেন।

কোন্ সময়ে যে এই বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়েছিল তা এখনও পর্য্যন্ত সঠিক জানা যায়নি। তবে এই বিশাল ধর্মসাহিত্য সম্পূর্ণ হ'তে যে বহু শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছিল সে বিষয়ে সবাই নিঃসন্দেহ।

এমন কি মহেন্-জো-দড়ো আবিষ্কৃত হবার পর কোন কোন ঐতিহাসিক এ কথাও বলেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতি বিশ হাজার বৎসরের পুরাতন। আর যাঁরা সব চেয়ে কম বলেন তাঁদেরও ধারণা পাঁচ হাজার বছরের কম কিছুতেই নয়। সুতরাং অনায়াসে ধরে নেওয়া যায় যে, আমাদের এই দেশেই প্রথম স্তুতিরূপে বেদগানের সৃষ্টি হয়েছিল অর্থাৎ এই দেশেই প্রথম সাহিত্যের জন্ম। কারণ মানবসভ্যতার

এর চেয়ে পুরাতন কোন নিদর্শন পৃথিবীর আর কোথাও আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি।

বেদের পর এলো উপনিষদ। আবার এই উপনিষদও নানা খণ্ডে বিভক্ত। যেমন—ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্য শ্বেতোত্তরীয়, কঠ, কেন, মাণ্ডুক্য প্রভৃতি। সৃষ্টিরহস্য, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, পরলোকরহস্য, মানুষের সুখ-দুঃখ, মুক্তির উপায় প্রভৃতি নানা দার্শনিক আলোচনা আছে এইগুলিতে। এইগুলির কতক রচনা করেছেন ঋষিরা, কতক বা তখনকার দিনের ঋষিতুল্য রাজারা—যাঁরা ভোগবিলাসে দিনরাত ডুবে না থেকে জ্ঞানচর্চ্চা করতেন অহরহ। মানুষের কল্যাণ-চিন্তাই ছিল তাঁদের একমাত্র কর্ত্তব্য, তাই সর্ব্বদা তার উপায় উদ্ভাবনে তাঁরা ব্যাপৃত থাকতেন। এই উপনিষদগুলি বহু পুরাতন হ'লেও আজও মানুষের জ্ঞান ও চিন্তাধারা এদের অতিক্রম করতে পারেনি। আজও আমাদের দেশের লোকেরা বেশী দুঃখ কষ্ট পেলে কিংবা বৃদ্ধ বয়সে, নানারকম সাংসারিক পীড়নে জর্জ্জরিত হ'লে এই সব গ্রন্থে শান্তি খোঁজেন। তা ছাড়া পরিণত বয়সে, বিষয়বুদ্ধি ও সাংসারিক বাসনা-কামনা যখন পেকে ওঠে তখন অনেক মানুষের ভুল ভাঙে, তারা বুঝতে পারে যে জ্ঞানের চর্চ্চা করে মনে যে শান্তি পাওয়া যায় তা আর কোন কিছুতেই পাওয়া যায় না। এই যে সংঘাত, এই যে সংসারে নিত্য হানাহানি, জীবনধারণের জন্য নিত্য নব নব দুঃখের সৃষ্টি, এর মধ্যে আসল সুখ নেই, আসল সুখ ওই সব গ্রন্থে, জ্ঞানের রাজ্যে।

রামায়ণ ও মহাভারত

এই সব গ্রন্থের পরে এলো রামায়ণ ও মহাভারত। প্রকৃতপক্ষে এরাই হ'লো সর্ব্বসম্মতিক্রমে ভারতের প্রাচীন কাব্য-গ্রন্থ। এ দু'টির মধ্যে প্রথম রচিত হয়েছিল রামায়ণ। কাজেই ভারতের আদি-কাব্য বললে বোঝায় রামায়ণকে।

প্রাচীন ভারতবাসীদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, সভ্যতা, সেই সময়কার সামাজিক অবস্থা, সমস্তই আমরা এই দু'টি গ্রন্থ থেকে জানতে পারি। উপন্যাসের মত সহজ ও সরল ভাষায় নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে নরনারীর চরিত্রের এমন নিখুঁত বিশ্লেষণ আজ পর্য্যন্ত আর কোন সাহিত্যে কেউ সৃষ্টি করতে পারেনি। যুগযুগ কেটে গেছে, কিন্তু আজও সেই সব চরিত্র সারা ভারতের ইতিহাসে আদর্শ হ'য়ে আছে, আজও আমরা তাদের স্মরণ ক'রে শ্রদ্ধায় মাথা নত করি, হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে নিজেদের ধন্য মনে করি। তাই এরা আমাদের জাতির সম্পদ, দেশের গৌরব! আমরা রামায়ণ ও মহাভারতকে মহাকাব্য বলি। মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণ হ'লো এই যে, তা চিরকালের চিরযুগের কাব্য। সমস্ত মানুষের সমস্ত জাতির আদর্শ ও তার অন্তরের ভাবধারা তার মধ্যে পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। যা শাশ্বত, যা চিরন্তন, তাকে আমরা দেখতে পাই তার ছত্রে ছত্রে।

খৃষ্ট জন্মাবার বহুশত বৎসর পূর্ব্বে প্রথম রামায়ণ রচিত হয়েছিল। এখন থেকে কতদিন আগের কথা, কিন্তু আজও রামায়ণ-মহাভারতের কদর কমেনি। ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসী হিন্দুর ঘরে অমর হ'য়ে আছে এই গ্রন্থ দু'টি। আজও হাজারে হাজারে লাখে লাখে বিক্রী হয় এই রামায়ণ-মহাভারত, প্রতি দেশে প্রতি ভাষায় নানা সংস্করণে অনূদিত হয়।

মূল রামায়ণ ও মহাভারত সংস্কৃত ভাষায় রচিত। কারণ আমাদের দেশে পণ্ডিতের ভাষা তখন ছিল সংস্কৃত। এখন জনসাধারণের জন্য প্রত্যেক ভাষায় এর প্রামাণ্য অনুবাদ বেরিয়েছে।

যে রামায়ণের এত নাম তা রচনা করেছিলেন কে জান? মহর্ষি বাল্মীকি। তোমরা শুনলে আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে যে ইনি প্রথম বয়সে ছিলেন দস্যু রত্নাকর। লোককে খুন ক'রে, মেরে-ধ'রে তার সর্ব্বস্ব অপহরণ ক'রে সংসার প্রতিপালন করতেন। শেষে দেবর্ষি নারদের উপদেশে একদিন তিনি দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে গভীর অরণ্যে গিয়ে তপস্যা করতে লাগলেন এবং ভগবানের অনুগ্রহ পেয়ে আবার নবজীবন লাভ করলেন। তাঁর জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হ'লো। দস্যু রত্নাকর হলেন মহর্ষি বাল্মীকি। যে হাতে একদিন অস্ত্রধারণ করেছিলেন সেই হাতে তিনি তখন লেখনী তুলে নিয়ে সৃষ্টি করলেন এই অমর কাব্য। যে আশ্চর্য্য ঘটনাকে লক্ষ্য ক'রে তাঁর মনে প্রথম কাব্যের প্রেরণা এসেছিল সেটা এইবার তোমাদের বলব।

একদিন মহর্ষি বাল্মীকি নদীতে স্নান করতে নামছেন এমন সময় দেখলেন তপোবনের ধারে নদীর সৈকতে দু'টি বক পরমানন্দে বিচরণ করছে। তাদের একটি আর-একটির সঙ্গে একমনে খেলা করছে—এই দৃশ্যটি দেখে মহর্ষির অন্তর আনন্দে অভিষিক্ত হ'য়ে উঠলো। কিন্তু ঠিক সেই সময় কোথা থেকে একটি ব্যাধ ঝড়ের মত সেখানে এসে পড়ে তাদের একটিকে তীরবিদ্ধ করলে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বকটি তৎক্ষণাৎ মরে গেল। এবং অপর বকটি তার শোকে কাতর হয়ে কাঁদতে লাগল। এই দৃশ্যটি দেখে সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষির চোখে জল এসে পড়লো। মনে মনে বললেন, রে ব্যাধ, তুই কি নিষ্ঠুর, তোর প্রাণে এতটুকু দয়ামায়া নেই? ভালবাসার খাতিরেও এক মুহূর্ত্তের জন্য এই হত্যাকাণ্ড থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারলি না?

তারপর অন্যমনস্ক ভাবে শ্লোকে অভিসম্পাত দিয়ে ফেললেন তাকে—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌॥

কিন্তু এই কথা ব'লে ফেলেই তাঁর মনে হ'লো, একি করলুম! কী আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল? এমন সময়ে আকাশে দৈববাণী হ'লো, বৎস, ভীত হ'য়ো না—তোমার মুখ দিয়ে এইমাত্র যা উচ্চারিত হ'লো তার নাম 'কবিতা'! তুমি জগতের কল্যাণের জন্য এই কবিতার দ্বারা রামচরিত রচনা করো।

এইভাবে প্রথম কবিতার সৃষ্টি হ'লো। এবং শোক থেকে এর উৎপত্তি হ'লো ব'লে এ'কে বলা হয় শ্লোক।

তখন মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত হলেন।

কিন্তু কি লিখবেন—রামের চরিত্র সম্বন্ধে তিনি তো কিছুই জানেন না? কলম হাতে ক'রে ভাবছেন, এমন সময় নারদ এসে তাঁকে বললেন—

"কবি তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

—হে কবি তোমার মনে রামচন্দ্রের সম্বন্ধে যখন যে চিন্তার উদয় হবে তাই সত্য জেনো।

মহর্ষি বাল্মীকি তখন আর দ্বিধা না ক'রে শ্লোকের পর শ্লোক রচনা ক'রে যেতে লাগলেন। এইভাবে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শেষ হ'লো।

এইবারে তোমাদের রামায়ণের গল্পটি খুব সংক্ষেপে বলবো।

প্রাচীনকালে অযোধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি অত্যন্ত সত্যপরায়ণ ও প্রজাবৎসল ছিলেন। তাঁর তিন রাণী ও চার ছেলে ছিল। রাণীদের নাম—কৌশল্যা,

কৈকেয়ী ও স্থমিত্রা এবং পুত্রগণের নাম—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন।

কৌশল্যার পুত্র রামচন্দ্র ছিলেন জ্যেষ্ঠ এবং সর্ব্বগুণালঙ্কৃত। সুতরাং বৃদ্ধ বয়সে দশরথ তাঁরই হাতে রাজ্যের ভার দিয়ে অবসর গ্রহণ করবেন ব'লে স্থির করলেন।

রামের রাজ্যাভিষেক, চারিদিকে উৎসব-আয়োজনের ধুমধাম পড়ে গেল। এমন সময় মহিষী কৈকেয়ী, তাঁর দাসী মন্থরার মন্ত্রণা শুনে রাজা দশরথের কাছে গিয়ে বর প্রার্থনা করলেন। এক সময় রোগশয্যায় কৈকেয়ীর সেবা-যত্নে মুগ্ধ হ'য়ে দশরথ তাঁকে দু'টি বর দেবেন ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কাজেই তিনি তৎক্ষণাৎ মহিষীকে বললেন, কি বর চাও বলো।

কৈকেয়ী বললেন, এক বরে আমার ছেলে ভরত রাজা হবে—আর এক বরে রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে বনে গমন করবে।

রাণীর মুখ থেকে এই রকম নিষ্ঠুর কথা শুনে রাজা দশরথ একেবারে চমকে উঠলেন। তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। সত্যনিষ্ঠ রাজা কিন্তু বুক ফেটে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারলেন না, রাণীর ইচ্ছাই পূর্ণ করলেন। কিন্তু বৃদ্ধ দশরথ এই শোক সহ্য করতে না পেরে শীগ্‌গিরই মৃত্যু-বরণ করলেন।

রামচন্দ্র পিতৃ-সত্য-পালনের জন্য বনে গেলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী সীতাদেবী ও লক্ষ্মণ তাঁর সঙ্গ নিলেন। তাঁরা কেউই রামচন্দ্রকে ছেড়ে থাকতে রাজী হলেন না: ভরত তখন বাড়ী ছিলেন না, নন্দীগ্রামে মাতুলালয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে মায়ের এই কীর্ত্তি দেখে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হলেন। ভরত রামচন্দ্রকে দেবতার মত ভক্তি করতেন, তাই সিংহাসনে বসা দূরে থাক্ তিনি তৎক্ষণাৎ বনে ছুটলেন, পায়ে ধরে রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনবার জন্য। কিন্তু রামচন্দ্র ভরতের

অনুরোধ রক্ষা করতে পারলেন না, পাছে পিতা সত্যভ্রষ্ট হন এই ভয়ে। তিনি তখন অনেক বুঝিয়ে শুঝিয়ে ভরতকে আবার রাজ্যে ফিরে যেতে বললেন।

ভরত দাদার কথা অমান্য করলেন না। তিনি ফিরে এলেন রামচন্দ্রের পাদুকা মাথায় নিয়ে এবং সিংহাসনে নিজে না বসে তার উপরে জ্যেষ্ঠভ্রাতার চরণাধার দু'টি স্থাপন ক'রে ভৃত্যের মত দাদার রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন। কিন্তু তাই ব'লে বনে গিয়ে যে রামচন্দ্র খুব অসুখী ছিলেন তা নয়। কারণ লক্ষ্মণ কেবল যে রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন তা নয়, একাধারে ভ্রাতা, বন্ধু, ভৃত্য, সহচর সবই ছিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে পিতার মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। আর সীতাদেবী ছিলেন তাঁর আদর্শ স্ত্রী। ছায়ার মত তিনি রামচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে ফিরতেন। স্বামীর সুখে তাঁর সুখ, স্বামীর দুঃখে তাঁর দুঃখ। এ ছাড়া আর তাঁর জীবনের কোন লক্ষ্য ছিল না। দেবর লক্ষ্মণকে তিনি নিজের সন্তানের মত দেখতেন। লক্ষ্মণও সীতাদেবীকে জননীর মত মনে করতেন। সুতরাং বনে গিয়েও তাঁরা মনের সুখে দিনাতিপাত করতে লাগলেন।

প্রথম প্রথম দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে ভ্রমণ ক'রে শেষে রামচন্দ্র গোদাবরী নদীর তীরস্থ পঞ্চবটীবনে এসে একটা পাতার কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে সেখানে বসবাস করতে লাগলেন। সেই সময় একদিন এক কাণ্ড ঘটলো। লঙ্কার রাজা রাবণ ভিক্ষুকের বেশ ধরে এসে সীতাদেবীকে চুরি ক'রে নিয়ে গেলেন। রাবণ হলেন রাক্ষসদের রাজা, দেবতার বরে তিনি হয়েছিলেন প্রায় অজেয়। তাছাড়া সৈন্যসামন্ত লোকজনেরও তাঁর অভাব ছিল না। সীতাদেবীকে নিয়ে গিয়ে রাবণ অশোকবনে বন্দী ক'রে রেখে দিলেন।

এদিকে সীতার শোকে পাগলের মত হ'য়ে রাম ও লক্ষ্মণ বনে

বনে তাঁকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। তখন একদল বানরের সঙ্গে হঠাৎ তাঁদের দেখা হ'লো। বানরের রাজা সুগ্রীব তখন রামচন্দ্র ও লক্ষণের সাহায্য চাইলে। তাঁরা রাজী হলেন এবং সুগ্রীবের প্রধান শত্রু, তার ভাই বালীকে রামচন্দ্র বধ করলেন। এই ভাবে হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধার ক'রে সুগ্রীব তখন বানরের দলবল নিয়ে রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতার খোঁজে বেরুল। এদিকে কিছুদিন পরে হনুমান লঙ্কা থেকে সীতার সন্ধান এনে রামচন্দ্রকে দিলে।

তারপর রাম ও লক্ষ্মণ এই বানরদের সাহায্যে বিরাট যুদ্ধ ক'রে লঙ্কাপুরী ধ্বংস করলেন এবং সীতাকে উদ্ধার ক'রে আনলেন।

এইভাবে চৌদ্দবছর কেটে গেল। তখন আবার রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে গেলেন।

বহুদিন পরে রামচন্দ্রকে ফিরে পেয়ে প্রজারা আবার আনন্দ-উৎসবে মত্ত হ'লো। এইবার সত্যই তাঁর রাজ্যাভিষেক হ'লো। রামচন্দ্র অপত্যনির্বিশেষে প্রজা পালন করতে লাগলেন। তাঁর গুণগানে দেশ মুখরিত হ'য়ে উঠলো।

কিন্তু কিছুদিন পরেই সীতার সম্বন্ধে প্রজাদের মনে অত্যন্ত ক্ষোভ দেখা দিল। যিনি রাক্ষসের গৃহে এতদিন বাস ক'রে এসেছেন তাঁকে আবার রাণীর সম্মান দিতে তারা সবাই আপত্তি করলে। তখন রামচন্দ্র শুধু প্রজাদের সন্তুষ্টির জন্য প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় পত্নী সীতাদেবীকেও পরিত্যাগ করলেন।

সীতাদেবী স্বামীর এবং প্রজাদের কল্যাণের জন্য রাজ্য ছেড়ে আবার বনে চলে গেলেন। লক্ষ্মণ রথে ক'রে তাঁকে সেখানে রেখে এলেন। সেখানে তমসা নদীর তীরে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম ছিল। তিনি এই ব্যাপার জানতে পেরে কন্যার মত আদর ক'রে

সীতাদেবীকে নিজের আশ্রমে নিয়ে গিয়ে রাখলেন। বনবাসের সময় সীতাদেবী গর্ভবতী ছিলেন। লব ও কুশ নামে দুই যমজ সন্তান তিনি বাল্মীকির আশ্রমে প্রসব করলেন। বাল্মীকি তাঁদের ঋষিপুত্রের মত তপোবনে মানুষ করতে লাগলেন।

এইভাবে অষ্টাদশ বছর কেটে গেল।

এদিকে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করবার সঙ্কল্প করলেন। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে আছে স্ত্রী ব্যতীত কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান হয় না, তাই স্ত্রীর অপর নাম সহধর্ম্মিণী। তাই বিপদ হ'লো, প্রজারা যখন রামচন্দ্রকে পুনরায় বিবাহ করতে অনুরোধ করলেন তখন তিনি কিছুতেই তাতে সম্মত হলেন না। অবশেষে স্থির হ'লো সীতার স্বর্ণমূর্ত্তি পাশে নিয়ে রামচন্দ্র এই যজ্ঞ করবেন।

বিরাট যজ্ঞ। দেশদেশান্তর থেকে বহু মুনি-ঋষি তাতে নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছিলেন। বলা বাহুল্য, মহর্ষি বাল্মীকিও এসেছিলেন লব ও কুশকে সঙ্গে নিয়ে। যজ্ঞ আরম্ভ হবার পূর্ব্বে মহর্ষি বাল্মীকি লব ও কুশকে তাঁর রচিত রামায়ণ-গান সেখানে গাইতে বললেন। তিনি নিজে শিক্ষা দিয়ে তাদের এই রামায়ণ-গান আগাগোড়া শিখিয়েছিলেন।

অজ্ঞাত দু'টি বালকের মুখে রামায়ণ-গান শুনে সভাস্থ সকলে মুগ্ধ হ'য়ে গেল। কিন্তু বার বার সীতার কথা শ্রবণ ক'রে রামচন্দ্র শোকে উন্মত্তপ্রায় হ'য়ে উঠলেন। শেষে যখন সীতার বনবাসের কথা লব-কুশ অতি করুণ কণ্ঠে গাইতে লাগল, তখন রামচন্দ্র তা শুনে এমন শোকার্ত্ত হ'য়ে পড়লেন যে, বাল্মীকি ছুটে গেলেন তাঁকে সান্ত্বনা দিতে। তিনি তখন রামচন্দ্রের কাছে লব-কুশের পরিচয় দিলেন এবং বললেন, আপনি ধৈর্য্য ধরুন, আমি সীতাদেবীকে এখানে আনবার ব্যবস্থা করছি।

লক্ষ্মণ বাল্মীকির তপোবনে গিয়ে সীতাকে নিয়ে এলেন।

সভাস্থলে গিয়ে সীতাদেবী যখন সন্ন্যাসিনীর বেশে দাঁড়ালেন, তখন রামচন্দ্র সিংহাসন থেকে নেমে তাড়াতাড়ি তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এগিয়ে গেলেন। কিন্তু সভাস্থ প্রজামণ্ডলীকে যখন জিজ্ঞাসা করা হ'লো যে, সীতার সিংহাসন আরোহণ করায় কারুর আপত্তি আছে কি না, তখন সবাই চুপ ক'রে রইল। রামচন্দ্রের মুখ শুকিয়ে উঠলো। তিনি আবার প্রজাদের প্রশ্ন করলেন। তারা বললে, সীতাদেবীকে সকলের সামনে পরীক্ষা দিতে হবে।

ইতিপূর্ব্বে একবার তিনি অগ্নিপরীক্ষা দিয়েছিলেন কিন্তু সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে দেননি, এই জন্যই তখন তাঁকে প্রজারা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে চায়নি। আবার সেই কথা উঠতে সর্ব্বসমক্ষে সীতাদেবী লজ্জায় অধোবদন হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। খানিক পরে তিনি মুখ তুলে ধীরে ধীরে বললেন, বেশ, আমার প্রজারা যদি চায় তো আমি পরীক্ষাই দেব। কিন্তু এই আমার সর্ব্বশেষ পরীক্ষা! তারপর তিনি হাত জোড় ক'রে বললেন, হে দেবতামণ্ডলী, হে আমার পূজনীয় গুরুজনরা, আপনারা সকলে আমার এই পরীক্ষার সাক্ষী থাকুন। যদি আমি সত্যসত্যই নিষ্পাপ হই, যদি রাক্ষস-গৃহবাসে কোন দোষ আমাকে স্পর্শ করতে না পেরে থাকে, তাহ'লে এই মুহূর্ত্তে মাতা ধরিত্রী যেন আমাকে তাঁর গর্ভে স্থান দেন।

মহর্ষি বাল্মীকি তখন চীৎকার ক'রে উঠলেন, মূর্খ প্রজারা শীগ্‌গির মায়ের পায়ে ধর, মায়ের কাছে ক্ষমা চা—তা না হ'লে এখনি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে—নারীর অপমান সহ্য করতে না পেরে চেয়ে দেখ ওই পৃথিবী কেঁপে উঠেছে।

কিন্তু ততক্ষণে টলমল ক'রে উঠেছে পৃথিবী! আকাশ বাতাস সমস্ত যেন একসঙ্গে চীৎকার ক'রে সীতাকে ডাকতে লাগল—এমন সময় হঠাৎ মাটি ফেটে একটা বিরাট গহ্বরের সৃষ্টি হ'লো এবং দেখতে

দেখতে তার মধ্যে সীতাদেবী অন্তর্হিত হলেন।

পৃথিবীর মেয়েকে, পৃথিবী আবার ফিরিয়ে নিলেন।

'সীতা, সীতা' ক'রে রাম শুধু পাগলের মত বিলাপ করতে লাগলেন। কোথায় সীতা? জমির উপর সে গহ্বরের আর কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না।

এই হ'লো মোটামুটি রামায়ণের গল্প।

এর বহুদিন পরে ব্যাসদেব নামে আর একজন ঋষি অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করেন। কিন্তু পুরাণ রচনা করবার পর ব্যাসদেব মনে ভেবে দেখলেন যে, এই কঠিন ও দুরূহ জিনিস সাধারণ লোক সহজে বুঝতে পারবে না; তখন তিনি স্থির করলেন, এই পুরাণের বিষয়গুলি নিয়েই সহজ ও সরল ভাবে গল্পের ভিতর দিয়ে আর একটি মহাকাব্য রচনা করবেন। সেই মহাকাব্যই হ'লো মহাভারত।

আজও লোকে কথায় বলে 'যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে' অর্থাৎ মহাভারতে যা নেই সারা পৃথিবীতে তা নেই। মহাভারত সম্বন্ধে লোকের মনে যে কি রকম উচ্চ ধারণা ছিল এবং এখনো পর্য্যন্ত রয়েছে, তা এই সামান্য প্রবচন থেকেই সহজে বুঝতে পারা যায়।

বাস্তবিক এত বড় বিরাট গ্রন্থ বিশ্বসাহিত্যে আর নেই বললেই হয়। প্রায় দু'লক্ষ দীর্ঘ লাইন আছে এতে। হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস, নীতিমূলক অসংখ্য উপাখ্যান, পুরাণ, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় এর মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মহাভারত একাধারে এতগুলি তত্ত্বের সমষ্টি যে, এ'কে স্বচ্ছন্দে হিন্দুধর্ম্মের একটি বিরাট অভিধান বলা যেতে পারে।

কিন্তু এর মধ্যে এমন বহু আখ্যায়িকা আছে যাদের সঙ্গে মহাভারতের মূল কাহিনীর কোন যোগাযোগ নেই, অথচ কেবলমাত্র সুন্দর ভাবে বর্ণনার ফলে সমস্তটিকে একটি অখণ্ড জিনিস ব'লে মনে

হয়। ভাবের গভীরতায়, ভাষার স্বচ্ছতায়, নানা রসের সংমিশ্রণে এই মহাকাব্য সারা পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না।

আঠারোটি বৃহৎ খণ্ডে মহাভারতকে ভাগ করা হয়েছে। এবং তাদের সবগুলিই বেদব্যাসের রচনা ব'লে লোকে মনে করে। এই ব্যাসদেবের অপর নাম হ'লো কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। সমস্ত পুরাণ তাঁরই রচনা—হিন্দুদের মনে এই বিশ্বাস।

কেবলমাত্র ভারতবর্ষের প্রাচীন একটি বংশের জ্ঞাতি-বিরোধের কাহিনী মহাভারতের ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে পাওয়া যায়। এই দু'টি দলের নাম কৌরব ও পাণ্ডব। তাছাড়া মহাভারতে আরো যে অসংখ্য উপাখ্যানের উল্লেখ আছে, তা নাকি বহু পণ্ডিত ও দার্শনিক জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্য সুবিধামত এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। কাজেই যতই দিন কেটে গেছে ততই নানা ঘটনার ভারে মহাভারতের কলেবর এইভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই সমালোচকরা বলেন —মহাভারত একজনের লেখা নয়, বহু লোকের রচনার সংগ্রহ।

যাই হোক, একজনের লেখা কিংবা বহুজনের লেখা এ কথা নিয়ে তর্ক করার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা মহাভারত, ভারত তথা সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে আজও শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য হ'য়ে আছে। এবং যার শ্রেষ্ঠত্ব যুগ যুগ ধরে সর্ব্বলোকে মেনে আসছে, তার রচয়িতা যিনি বা যাঁরা হোন না কেন, তাতে ভারতবাসীদের গৌরব কিছুমাত্র হ্রাস পায় না। বরং এই ভেবে আমরা গর্ব্ব অনুভব করি যে, এই রকম একটা মহাকাব্য রচিত হয়েছে আমাদেরই দেশে।

গল্পটি নিশ্চয়ই তোমরা সবাই জান, তবুও আর একবার সংক্ষেপে বলি।

দিল্লী থেকে ষাট মাইল উত্তরে হস্তিনাপুর ব'লে একটি রাজ্য ছিল। পুরাকালে ভরত নামে এক রাজা সেখানে রাজত্ব করতেন। এঁরই নাম

থেকে ভারতবর্ষের নামকরণ হয়েছিল। ইনি রাজা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র।

এই রাজা ভরতের এক বংশধরের নাম হ'লো মহারাজ বিচিত্র-বীর্য্য। তাঁর আবার দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠের নাম ধৃতরাষ্ট্র, কনিষ্ঠের নাম পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন ব'লে পাণ্ডুই পিতার সিংহাসনে বসলেন। ধৃতরাষ্ট্রের ছিল একশো ছেলে—দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি, তাঁদের বলা হ'তো কৌরব; আর পাণ্ডুর মাত্র পাঁচটি ছেলে—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব, এদের বলা হ'তো পাণ্ডব।

কিছুকাল রাজত্ব করার পর পাণ্ডুর অকাল-মৃত্যু হ'লো। তখন পাণ্ডবরা ছোট ব'লে ধৃতরাষ্ট্র অভিভাবক হলেন এবং পাণ্ডুর পাঁচ ছেলেকে নিজের ছেলেদের মত ক'রে তিনি একসঙ্গে লালন পালন করতে লাগলেন।

রাজপুত্রদের যখন শিক্ষা সমাপ্ত হ'লো তখন যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করাই উচিত ছিল। কিন্তু শিক্ষায় দীক্ষায় জ্ঞানে বুদ্ধিতে বলবীর্য্যে দেখতে দেখতে পাণ্ডুর ছেলেরা এমন উন্নত হ'য়ে উঠল যে ঈর্ষায় কৌরবদের বুক ফেটে যেতে লাগল। দুর্য্যোধন ভায়েদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে পাণ্ডবদের মেরে-ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রথমে তাঁরা গালা দিয়ে একটা বাড়ী তৈরী করিয়ে সেখানে তাঁদের পুড়িয়ে মারবার জন্য ছল ক'রে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু আগেই জানতে পেরে পাণ্ডবরা সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণরক্ষা করলেন। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের বৈমাত্রেয় ভাই। তিনি অতি মহৎচরিত্র, সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি পাণ্ডবদের বড় ভালবাসতেন তাই কৌরবদের এই দুরভিসন্ধি জানতে পেরে গোপনে পাণ্ডবদের সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন।

কৌরবরা সেই গালার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে ভেবেছিলেন

পাণ্ডবরা পুড়ে মরে গেছেন, তাঁরা নিষ্কণ্টক হয়েছেন। কিন্তু তা হ'লো না, পাণ্ডবরা পালিয়ে গিয়ে ছদ্মবেশে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। বহুদিন পরে কৌরবরা খবর পেলেন যে, পাণ্ডবরা এখনো জীবিত আছেন। আর শুধু তাই নয়, তাঁরা ধনুর্ব্বিদায় অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে স্বয়ংবর সভা থেকে পাঞ্চাল-রাজার কন্যা দ্রৌপদীকে বিবাহ করেছেন।

ধৃতরাষ্ট্র একে ছিলেন অন্ধ, তায় অত্যধিক পুত্রস্নেহে প্রায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে গিয়েছিলেন। সেই জন্যই কৌরবরা পাণ্ডবদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে সাহস পেতেন, কারণ ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বদা নিজের ছেলেদের ক্ষমা করতেন। যাই হোক, পাণ্ডবরা যখন বেঁচে ফিরে এলেন তখন আর উপায় রইল না। অগত্যা তাঁরা পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করলেন, এবং তাদের হস্তিনাপুরে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে অর্দ্ধেক রাজ্য দিয়ে দিলেন।

পাণ্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন ক'রে বসবাস করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির হলেন রাজা। তিনি এমন ধর্ম্মপ্রাণ ও জ্ঞানী ছিলেন যে, চারিদিকে তাঁর নামে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল। লোকে যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি ব'লে পূজা ও ভক্তিশ্রদ্ধা করতে লাগল, এবং 'ধর্ম্মরাজ' এই আখ্যা দিলে।

কৌরবরা কখনও পাণ্ডবদের ওপর খুশী ছিলেন না। তাঁরা এখনো মতলব খুঁজতে লাগলেন এদের জব্দ করার জন্য। শেষে মাতুল শকুনির পরামর্শে কৌরবরা পাণ্ডবদের এক পাশা খেলায় নিমন্ত্রণ করলেন এবং বাজি রেখে পাশা খেলতে খেলতে পাণ্ডবদের যথাসর্ব্বস্ব জিতে নিলেন। পরে আরো হেরে গিয়ে পঞ্চপাণ্ডব সর্ব্বস্বান্ত হলেন এবং বারো বছরের জন্য দ্রৌপদীকে নিয়ে বনে নির্ব্বাসিত হলেন। শকুনিই এই সমস্তের মূল। কারণ তিনি পাশাখেলার মধ্যে বরাবর এমন একটা প্রতারণা

করছিলেন যা পাণ্ডবরা কেউ ধরতেই পারেন নি। তাঁরা ভেবেছিলেন বুঝি ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ তাঁরা খেলায় হেরে যাচ্ছেন।

এইভাবে অধর্ম্মের আশ্রয় নিয়ে, জুয়াচুরি ক'রে পাণ্ডবদের রাজ্যচ্যুত ক'রে কৌরবরা তাঁদের প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করলেন।

এদিকে বারো বৎসর কাল বনবাস শেষ হ'য়ে যাবার পর বাজির সর্তানুসারে আরো এক বৎসর অজ্ঞাতবাস ক'রে পাণ্ডবরা যখন এসে তাঁদের রাজত্ব ফিরে চাইলেন, তখন দুর্য্যোধন স্পষ্টই বললেন, সূচের ডগায় যেটুকু মাটি ধরে ততটুকুও দেবো না, ক্ষমতা থাকে তো যুদ্ধ ক'রে নাও।

পাণ্ডবরা পাঁচভাই-ই অসাধারণ বীর। তার মধ্যে অর্জ্জুন ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু তবুও পাণ্ডবরা প্রথমটা ভাইদের সঙ্গে, পরম আত্মীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে রাজী হলেন না। সন্ধি করার জন্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বার বার চেষ্টা করতে লাগলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেম এঁদের আত্মীয় ও বিশেষ বন্ধু। তিনিও যুদ্ধ থামাবার অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে অর্জ্জুন প্রথমটা আত্মীয়দের মারতে কষ্ট বোধ করেছিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অনেক বুঝিয়ে তাঁকে প্রকৃতিস্থ করলেন।

তিনি বললেন, কেউ কাউকে মারতে পারে না, আমিই সবাইকে মেরে রেখেছি—মানুষ উপলক্ষ মাত্র। এই ব'লে অর্জ্জুনকে তিনি বিশ্বরূপ দেখালেন। অর্জ্জুন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত ও সখা। শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সাক্ষাৎ নররূপধারী ভগবান, বিশ্বচরাচরে যিনি পরিব্যাপ্ত, তাঁর দেহে অর্জ্জুন সমস্ত পৃথিবীকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গেলেন।

ভারতের এই অংশটির নাম গীতা। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে সব উপদেশ দিয়েছিলেন, সারা পৃথিবীতে তার মত মনুষ্য-জীবনের পক্ষে হিতকারী ও একান্ত প্রয়োজনীয় বাণী আজ পর্য্যন্ত আর কোন

সাহিত্যে সৃষ্টি হয়নি। আজও তাই এই গীতার জন্য ভারতবর্ষ বিশ্বে জ্ঞানজগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার ক'রে আছে।

ও পক্ষেও দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং এবং অন্যান্য আত্মীয়ের অনেক বোঝালেন কিন্তু তাতে কোন ফল হ'লো না। শেষে যুদ্ধই স্থি হ'লো! এই যুদ্ধের নাম কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। ভারতের ক্ষত্রিয়রা প্রায় ধ্বং হ'য়ে গিয়েছিল এই যুদ্ধে। তখনকার দিনে এতবড় যুদ্ধও আর কে কোনদিন কল্পনা করতে পারেনি—ভাবে ভাষায় বর্ণনায় এই নিখুঁত চিত্রটি বিশ্বলোকের কাছে আজও বিস্ময় ব'লে মনে হয়।

আঠারো দিন ধরে এই যুদ্ধ হয়েছিল। প্রতিদিন কত লক্ষ লং লোক যে এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছে তার ঠিক নেই। অবশেে একদিন ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের পরাজয় হ'লো। অর্থাৎ পাণ্ডবরা জিতলেন।

কিন্তু যুদ্ধ শেষ হ'য়ে যেতে যুধিষ্ঠিরের মনে বড় ব্যথা লাগল তিনি ভাবলেন, কাকে নিয়ে রাজত্ব করবো! আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধ যে যেখানে ছিল সবাই তো মরে গেছে। তাই কিছুদিন পরে পঞ্চপাণ্ড ও দ্রৌপদীকে নিয়ে রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে তিনি হিমালয়ের পথ ধ স্বর্গের দিকে যাত্রা করলেন।

সংক্ষেপে মহাভারতের গল্পটি হ'লো এই। তোমরা বড় হ'ে যখন সমস্ত মহাভারতটি আগাগোড়া পড়ে দেখবে তখন বুঝতে পার কি বিপুল ঐশ্বর্য্য এর মধ্যে আছে, যার জন্য আজ মহাভারত পৃথিবী মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের স্থান অধিকার ক'রে আছে।

বলা বাহুল্য যে, এই সমস্ত মহাকাব্য এবং আমাদের প্রাচীন সাহিত্য বলতে যা কিছু, সবই রচিত হয়েছিল সংস্কৃত ভাষায়। এখন ভিন্ন ভিন্ন দেশের মাতৃভাষায় অনূদিত হ'য়ে আমাদের সাহিত্য সমগ্র জগতের সাহিত্যে পরিণত হয়েছে।

গ্রীককাব্যের জন্মদাতা হোমার

আমাদের দেশের প্রাচীনতম সাহিত্য রামায়ণ ও মহাভারত যেমন জন্মলাভ করেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে, ইউরোপের প্রাচীনতম সাহিত্য তেমনই জন্মলাভ করেছে গ্রীক ভাষা থেকে। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, আজ পর্য্যন্ত সেই অতি পুরাতন কাব্যগুলিকে অতিক্রম ক'রে আর কোন কাব্য সেখানে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারেনি। আজও সেই পুরাতন গ্রীকলেখকরা সাহিত্যে প্রায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার ক'রে আছেন। আজও যাঁর নাম শুনলে সমস্ত ইউরোপ সম্ভ্রমে মাথা নত করে, তিনি হলেন গ্রীক সাহিত্যের অদ্বিতীয় লেখক হোমার।

তাঁর জন্মের পর থেকে এত দীর্ঘকাল অতিবাহিত হ'য়ে গিয়েছে যে, লোকে ভুলে গেছে তাঁর জন্মতারিখ। এমনকি কোন্ দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা নিয়ে পর্য্যন্ত রীতিমত গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে। এখন বহুদেশ দাবী করেছে যে, হোমার তাদের দেশের লোক। কারণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির জন্মস্থান হওয়া দেশের পক্ষে যেমন গৌরবের বিষয়, সমগ্র জাতির পক্ষেও তেমনি।

হোমারের সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে, তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি ছিলেন একজন অন্ধ ভিক্ষুক। প্রাচীন নগরী 'থিবিস' -এর তোরণদ্বারে বসে গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষা করতেন, এবং কখনো বা কাব্যের মধ্য দিয়ে নানা বীরত্বব্যঞ্জক গাথা বর্ণনা করতেন। সেই কাহিনীগুলিই বর্ত্তমানে পৃথিবীতে 'ইলিয়াড ও ওডিসি' নামে পরিচিত হয়েছে।

হোমারের জীবনী নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ বহুলোকের বিশ্বাস হোমার ব'লে কোন একজন লোকই পৃথিবীতে ছিলেন না। কতকগুলি গল্পের সমষ্টিকে নাকি 'হোমার'

এই নাম দেওয়া হয়েছে। সেই গল্পগুলি বলেছেন বহুলোক এবং লিখেছেন বহুলোকে; আর শেষকালে সেইগুলিকে একত্রে সংগ্রহ করেছেন আরো কতকগুলি লোক যাঁদের নাম অজ্ঞাত—আজ পর্য্যন্ত জানা যায়নি।

যাহোক হোমার ব'লে কোন লোক ছিল কি না ছিল, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ ক'রে লাভ নেই। তবে এ সম্বন্ধে সবাই নিঃসন্দেহ যে, তিনি যিনিই হোন গ্রীকলেখকদের মধ্যে ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ! এমন কি প্রাচীনকালে গ্রীকজাতির মধ্যে তাঁর কবিতা ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ হ'য়ে পড়েছিল। সেই সময়ে 'এথেন্সে' একটা বিশেষ আইন হ'য়ে গিয়েছিল যে, যে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁর কবিতা আবৃত্তি করতে হবে এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আবৃত্তি যে বা যারা করতে পারবে তাদের পুরস্কৃত করা হবে।

কাজেই এইভাবে সেই কবিতাগুলি যখন-তখন নকল করা হ'তো, উদ্ধৃত করা হ'তো এবং সর্ব্বদা বহুভাবে সমালোচিত হ'তো।

এমনি ক'রে যুগের পর যুগ চলে গেছে, কিন্তু এখনো সেই কবিতাগুলির গৌরব তেমনি অম্লান ও অপ্রতিহত হ'য়ে আছে। বর্ত্তমানকালের সমালোচকরা বহু গবেষণা ক'রে স্থির করেছেন যে, হোমারের মত আর কোন নাম এত ভক্তি ও শ্রদ্ধা পাবার উপযুক্ত নয়।

হোমারের কবিতার মধ্যে সকলের চেয়ে সুন্দর হ'লো 'ইলিয়াড' —ট্রয় যুদ্ধের বিবরণী। গ্রীকরা একে বলে 'ইলিয়াম'।

যদিও ট্রয় যুদ্ধের তারিখ হারিয়ে গেছে, তবুও একে অবলম্বন ক'রে যে কাহিনীর বর্ণনা আছে ইলিয়াডে, তা যেমন অদ্ভুত তেমনি বিস্ময়কর! গল্পটি সংক্ষেপে হ'লো এই—

আমাদের যেমন দেবরাজ ইন্দ্র, গ্রীকদের দেবরাজ হলেন তেমনি

জিয়াস্। একদিন তিনি স্বর্গের সমস্ত দেব-দেবীকে এক ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। শুধু একজনকে তিনি বাদ দিলেন—তিনি হলেন অশান্তির দেবী। এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য সেই দেবী তখন করলেন কি, দেবতারা যেখানে বসেছিলেন তার মাঝে একটা সোনার আপেল গড়িয়ে দিলেন। সেই আপেলটার ওপর লেখা ছিল 'সকলের চেয়ে যে সুন্দর তার জন্য'। এখন কে সেইটে নেবে, তাই নিয়ে বাধল মহা গোলমাল!

হীরা, এথিনি ও এফ্রোডাইট—স্বর্গের এই তিনজন পরমাসুন্দরী দেবী সেই আপেলটি দাবী করলেন প্যারিসের কাছে গিয়ে।

প্যারিস হ'লো একজন মেষপালক—সুন্দর ও সুশ্রী যুবক! তাঁরা তিনজনেই ঘুষ দিয়ে হাত করতে চাইলেন এই প্যারিসকে।

এফ্রোডাইট হলেন রতি দেবী। তিনি তখন সেই আপেলটি পাবার জন্য এমন উঠে পড়ে লাগলেন যে, প্যারিস কিছুতেই তাঁর হাত থেকে রক্ষা পেল না। শেষে তাঁকেই আপেলটি সে দেবে ব'লে স্থির করলে।

এফ্রোডাইট তাকে প্রচুর লোভ দেখালেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, আপেলটি পেলে তিনি প্যারিসের সঙ্গে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর বিয়ে দিয়ে দিবেন।

এই কথা শুনে প্যারিস আর লোভ সামলাতে পারলে না। আপেলটি তাঁকে দিয়ে দিলে।

এফ্রোডাইটও তাঁর কথা রাখলেন।

গ্রীসের রাজকুমার 'মেনিল্যেয়াসে'র স্ত্রী 'হেলেন' তখন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপসী। তিনি তাকে চুরি ক'রে নিয়ে এসে প্যারিসকে উপহার দিলেন। প্যারিস হেলেনকে নিয়ে নিজের দেশে পালিয়ে গেল।

তখন, মেনিল্যেয়াস তাঁর বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য রাজা-রাজড়াদের

সাহায্যে হেলেনকে উদ্ধার করবার আয়োজন করতে লাগলেন। সৈন্য সামন্ত, ঢাল তলোয়ার, তীর ধনুক নিয়ে বহু জাহাজ ছুটলো ট্রয়ের দিকে।

ট্রয় এশিয়া-মাইনরের অন্তর্গত একটি ছোট্ট জেলা। অনেক বিপদ আপদের মধ্যে দিয়ে গ্রীকরা পৌঁছলেন সেখানে। এবং সেই বহু মিনার সুশোভিত ট্রয়নগরীকে আক্রমণ করলেন।

দশ বৎসর ধরে চললো এই যুদ্ধ। বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো। তার মধ্যে উভয় দলে কত যোদ্ধা, কত দেব-দেবী যে এসে যোগদান করলেন তার ঠিক নেই।

ট্রোজানদের নায়ক হলেন, 'হেক্টর'। ট্রয়ের বৃদ্ধ রাজা 'প্রায়ামে'র জ্যেষ্ঠ পুত্র তিনি। যেমন অভিজ্ঞ যোদ্ধা তেমনি দুর্দ্ধর্ষ বীর!

আর গ্রীকদের নায়ক হলেন বীরশ্রেষ্ঠ 'একিলিস'। বহু যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে তিনি বহু যশ অর্জ্জন করেছিলেন। তিনি হেক্টরকে হত্যা ক'রে তাঁর মৃতদেহকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা করলেন। গ্রীকদের মনে তখন জয়ের আশা বেড়ে উঠলো। কিন্তু এ আশা বেশীক্ষণ রইল না। কারণ শীঘ্রই একিলিস মৃত্যুকে বরণ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাদের জয়ের আশা দুরাশায় পরিণত হ'লো। তখন গ্রীকরা ট্রয় ছেড়ে চলে যাবার ভাণ করলে এবং একটা বিরাট কাঠের ঘোড়া সেখানে রেখে সকলে জাহাজে গিয়ে উঠলো।

ট্রোজানরা মনে করলে সত্যি সত্যি বুঝি গ্রীকরা চলে গেল, আর যাবার সময় সেই ঘোড়াটাকে তাদের উপহার দিয়ে গেল। তাই টানতে টানতে সেই কাঠের ঘোড়াটাকে তারা শহরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে রাখলে।

এদিকে হ'লো কি, ঘোড়াটার পেট যে ফাঁপা ছিল, এবং তার মধ্যে যে বাছাই করা গ্রীক সৈন্য লুকানো ছিল, ট্রয়বাসীরা সেকথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তাই গভীর রাত্রে সবাই যখন শান্তিতে নিদ্রা যাচ্ছে,

সেই অবসরে গ্রীকসৈন্যরা ঘোড়ার পেট থেকে বেরিয়ে চুপি চুপি নগরের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিলে। অন্ধকারে হুড় হুড় ক'রে তখন গ্রীকসৈন্যেরা শহরের মধ্যে ঢুকে পড়লো এবং হত্যা ক'রে, লুঠতরাজ ক'রে, আগুন লাগিয়ে সমস্ত ট্রয়টাকে ছারখার ক'রে দিল। এইভাবে একটা বিরাট জাতি ধ্বংসমুখে পতিত হ'লো। মোটামুটি এই হ'লো ইলিয়াডের গল্প।

'ওডিসি'কে হোমারের দ্বিতীয় মহাকাব্য বলা হয়। কিন্তু আসলে ওটা কোন স্বতন্ত্র কাব্য নয়—'ইলিয়াডে'রই একটা চলতি অংশ।

এর নায়ক হচ্ছেন 'ওডিসিউস্'—গ্রীকদেশের এক রাজকুমার। ট্রয়যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে তিনি বাড়ী যাচ্ছিলেন। তাঁর বাড়ী হ'লো 'ইথাকা' দ্বীপে। ট্রয় থেকে এই দ্বীপের দূরত্ব খুব বেশী নয়, কিন্তু দেবতার রোষে তাঁকে বহু বৎসর ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল সমুদ্রের মধ্যে বিপদগ্রস্ত ও পথভ্রান্ত হ'য়ে। যদিও বহু বিশ্বস্ত নাবিক ছিল তাঁর সঙ্গে তবুও এর জন্য তাঁকে কল্পনাতীত দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল।

প্রথমে তিনি 'সারসি' নামে একটি ডাইনির কবলে গিয়ে পড়েন। তারপর মায়াবিনী জলকন্যাদের মায়াজাল ভেদ করেন। তারপর একচক্ষু দৈত্য 'সাইক্লোপ্‌স'-এর গ্রাস থেকে মুক্তি পেয়ে পলায়ন করেন। এ ছাড়াও আরো অনেক বিপদের মধ্যে তিনি পড়েছিলেন এবং বহু কষ্টে তা থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে শেষে সাধ্বী স্ত্রী 'পেনেলোপী'র সঙ্গে মিলিত হন। এই দীর্ঘকাল ধরে পেনেলোপী তাঁর স্বামীর পথ চেয়ে বসেছিলেন।

এই দু'টি হ'লো হোমারের বিখ্যাত কবিতা—মধুর সুললিত ছন্দে প্রাচীন গ্রীক ভাষায় রচিত। এর পরে আর কোন কবি এই দু'টি কবিতার এর চেয়ে ভালো রূপ দিতে পারেন নি। এই কবিতা দু'টি

বহুবার বহুকবির আদর্শ হয়েছে এবং তাঁদের প্রেরণা জুগিয়েছে। তার প্রমাণ পরবর্ত্তী অনেক কবির কাব্য থেকে পাওয়া যায়।

যাই হোক, এর মধ্যে ওদিকে হ'লো কি, এইভাবে বহুদিন এবং বহুবছর কেটে যাবার পরও যখন পেনেলোপী স্বামীর পথ চেয়ে বসেছিলেন তখন বহু রাজপুত্র, বহু দেশ থেকে এসে আবার তাঁকে বিবাহ করতে চাইলেন।

পেনেলোপী স্বামীকে দেবতার মত ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। তিনি সেই সব বিবাহেচ্ছু যুবকদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এক মতলব আঁটলেন। তিনি তখন তাঁর শ্বশুরের জন্য একটা কাপড় বুনতে বসলেন এবং সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে, এই কাপড়খানি বোনা যেদিন শেষ হবে, সেই দিনই তিনি উপস্থিত যুবকদের মধ্যে থেকে একজনকে স্বামীরূপে বেছে নেবেন। স্বামী মরে গেলে অথবা দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকলে গ্রীসদেশে সে সময় স্ত্রীলোকদের আবার বিয়ে করার নিয়ম ছিল।

তাই পেনেলোপীর এই কথা শুনে তখন তাঁর ভাবী স্বামীরা সবাই আশ্বস্ত হলেন এবং তাঁরা সাগ্রহে দিন গুনতে লাগলেন কবে সেই কাপড় বোনা কার্যটি শেষ হবে।

এদিকে পেনেলোপী করতেন কি, প্রতিদিন দিনের বেলায় যতটা ক'রে কাপড় বুনতেন, রাত্রে আবার চুপি চুপি ঠিক ততটা খুলে রাখতেন। কাজেই কোন দিন আর তাঁর সেই কাপড় বোনা শেষ হ'ত না।

এইভাবে যখন দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল, তখন তাঁর হবু স্বামীরা বিরক্ত হ'য়ে বিবাহের জন্য পেনেলোপীকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

এমন সময় একদিন দৈব-প্রেরিতের মত হঠাৎ ওডিসিউস্ ফিরে

এলেন বাড়ীতে। এবং সেই সব অবাঞ্ছিত অতিথিদের হত্যা ক'রে পেনেলোপীকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করলেন।

এইখানে 'ওডিসি' গল্পের শেষ।

চীনের পল্লবকাব্য

এইবার চীনের কথা বলবো। সকল দেশের মত চীনের সাহিত্যও জন্মেছে তাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ থেকে। চীনে তিনটি ধর্ম প্রধান, প্রত্যেকেরই নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ আছে। আমাদের দেশে যেমন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়, চীনেও তেমনি তিন রকমের ধর্মমত প্রচলিত ছিল এবং এখনো আছে। কনফুসিয়াসিসম্, তাও-ইসম্ ও ফো-ইসম্।

কিন্তু চীনের লোকেরা ধর্মমত সম্বন্ধে এমন উদাসীন যে তিনটি ধর্মকেই তারা মেনে চলে, আমাদের দেশের মত মারামারি কাটাকাটি ক'রে মরে না। তবে অধিকাংশ লোক দু'টি ধর্মকে মানে। কিন্তু চীনের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম—যা সেখানকার অধিকাংশ লোক মেনে চলে, এমনকি গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত যাকে স্বীকার করে, তা হ'লো কনফুসিয়াসিসম্।

কনফুসিয়াসিসম্ হ'লো কনফুসিয়াস্ ব'লে চীনের যে প্রধান ধর্মগুরু ছিলেন তাঁর প্রচারিত মতবাদ।

তাও-ইসম্-এর ধর্মগ্রন্থকে দার্শনিক গ্রন্থ বললেই ভাল হয়। এ অনেকটা আমাদের দেশের উপনিষদের মত। লাও-ৎসি এর প্রচারক।

আর ফো-ইসম্ হ'লো বৌদ্ধধর্ম। 'ফো' মানে বুদ্ধ। তবে আমাদের দেশের বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে এর একটু তফাৎ আছে।

কনফুসিয়াস্ ব'লে একটি লোক খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫১ শতকে জন্মেছিলেন এবং তিয়াত্তর বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। তাঁর আসল নাম কঙ-ফুৎসি। তিনি বুদ্ধের সমসাময়িক লোক ছিলেন। আমরা যেমন বুদ্ধকে

ভগবানের অবতার ব'লে মনে করি, চীনে কনফুসিয়াস্ ছিলেন তেমনি এবং তিনি যে উপদেশাবলী দিয়ে গিয়েছিলেন, চীনেরা তাকে ভক্তি সহকারে আজও মান্য ক'রে চলে। কনফুসিয়াসের এই পবিত্র বাণীগুলি যে সকল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা দু'শ্রেণীর।

প্রথম হ'লো পাঁচটি মহাকাব্য ও পাঁচটি রাজা। এগুলিকে প্রাথমিক ধর্ম্মগ্রন্থ বলা হয়। প্রথম জীবনে এগুলি কনফুসিয়াস্ লিখেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ বা এর পরেই হ'লো 'ফোর বুকস্' বা চারিখানি গ্রন্থ। এগুলি হয়তো তাঁর পরিণত বয়সে লেখা। যদিও কালের গতিতে এগুলির মধ্যে কিছু অদলবদল হয়েছে, তবুও নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, কনফুসিয়াস্ এবং তাঁর প্রধান শিষ্যরা এই গ্রন্থগুলিতে প্রকৃত শিক্ষার যে জ্ঞানগর্ভ বাণী দিয়ে গিয়েছেন তা সত্যই অমূল্য ও অতুলনীয়।

এই ধর্ম্মগ্রন্থগুলিতে কতকগুলি জিনিস আছে যা সহজেই চোখে পড়ে। প্রথমতঃ তদানীন্তন কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা। সেই সময় চীনও বহু ছোট ছোট দেশে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক দেশেই একজন ক'রে শাসনকর্ত্তা ছিলেন, যাঁরা নিজেদের 'ভগবানের সন্তান' ব'লে মনে করতেন। কেননা চীনের সম্রাট ও নৃপতিকে তখন ওই আখ্যাই দেওয়া হ'তো।

দ্বিতীয়তঃ কনফুসিয়াসের মতবাদের মধ্যে কোন নিয়মানুবর্ত্তিতা ছিল না। কাজেই এ সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে জানতে গেলে তিনি কথোপকথনের ছলে যা যা বলেছিলেন সেই সব যে গ্রন্থগুলিতে আছে তা পাঠ করতে হয়। অনেকটা আমাদের দেশের 'রামকৃষ্ণ কথামৃতে'র মত। তাছাড়া এবিষয়ে বুদ্ধ, সক্রেটিস, যীশুখৃষ্টের সঙ্গে অনেক মিল আছে কনফুসিয়াসের।

তৃতীয়তঃ এই মহাকাব্যগুলিতে রাজনৈতিক অবস্থার কথাই বেশী বলা হয়েছে। আধ্যাত্মিক কথা বা ধর্ম্মনীতির বিশ্লেষণ খুব কমই আছে।

তখনকার শাসন পদ্ধতি কি রকম ছিল এবং তখনকার বড় বড় রাজা ও সাধুদের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী, তাঁদের বাণী, নেতৃস্থানীয় শিক্ষিত লোকদের বক্তৃতা প্রভৃতি নিয়েই অধিকাংশ গ্রন্থ লেখা। তাছাড়া কোন কোন রাজ্যে কি রকম শাসননীতি, কোথাকার গভর্ণমেণ্ট কি ভাবে কাজ করে, ষ্টেটগুলির সঙ্গে সাম্রাজ্যের কি রকম সম্বন্ধ এবং আরো বহু স্তোত্র, ধর্ম্মসঙ্গীত ও ঐতিহাসিক কাহিনী হ'লো এই সব গ্রন্থের প্রধান বক্তব্য।

কনফুসিয়াস্ কখনো মুখে স্বীকার করতেন না যে, তিনি নিজে এই সব লিখেছেন বা বলেছেন। তিনি বলতেন যে, মহাপুরুষদের বাণী তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন মাত্র। তিনি শুধু লিপিকার—স্রষ্টা নন। অন্যের বাণী তিনি প্রচার করেছেন। তিনি সাধু সন্ন্যাসীদের খুব ভালবাসতেন তাই তাঁদের ধর্ম্ম বা তাঁদের মুখ থেকে ধর্ম্মসাহিত্যের যে সব কথা শ্রবণ করতেন তা নিয়ে মনে মনে চিন্তা করতেন। আর কেবল চিন্তা ক'রেই ক্ষান্ত হতেন না, তা থেকে নিজের মত গঠন ক'রে ব্যক্ত করতেন স্বাধীনভাবে।

তা ছাড়া আর একটা জিনিস এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে, চীনের লোকেদের বিশ্বাস তাদের প্রাচীনতম গ্রন্থগুলি এই পৃথিবীর লোকেরাই সৃষ্টি করেছেন—ভগবান নিজে এসে কোনদিন রচনা করেননি। এমন কি কনফুসিয়াসের মতবাদকেও তারা ধর্ম্মগ্রন্থ না ব'লে কতকগুলি সুসম্বদ্ধ নীতিমূলক উপদেশ ও সভ্যতার নিদর্শন ব'লে মনে করে। তাই সর্ব্বদা ভগবান, দেবদেবী, পূজা অর্চ্চনা, মন্দিরের উল্লেখ তারা পছন্দ করে না। তাদের বিশ্বাস, তাদের ক্রিয়াকলাপ, চিন্তাধারা সব এই পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ। তাই তারা নিজেদের কখনো কেউ দেবতা বা মহাপুরুষ ব'লে মনে করত না। মানুষ-ই তাদের কাছে সবচেয়ে বড়। পূজা পার্ব্বণ, দান ধ্যান যা কিছু তারা করে সে

শুধু হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তিগুলির প্রসারতার জন্য, মহত্তর প্রেরণা লাভ করবার জন্য, এইরকম ছিল তাদের মনের বিশ্বাস। সেইজন্য চীনের পঞ্চকাব্যকে তারা পাঁচটি 'চীঙ' বলে। এদের নাম যথাক্রমে ই-চীঙ অর্থাৎ যে গ্রন্থে এই পরিবর্তনশীল জগতের কথা লেখা আছে ; সু-চীঙ অর্থাৎ ইতিহাসের বই ; সী-চীঙ—স্তব স্তোত্রের বই ; লী-চীঙ—আচার অনুষ্ঠানের বই ; এবং চুন-চুই-চীঙ—বসন্ত ও হেমন্ত ঋতুর বই।

কনফুসিয়াসের এই পাঁচখানি গ্রন্থই বিখ্যাত। এ ছাড়া আর যে চারখানি গ্রন্থ আছে তাদের সৎসাহিত্য ও চিন্তাশীল লেখা হিসাবে চীনেরা অত্যন্ত সম্মান করে। এখনও তাদের বিশ্বাস যে, এই চারখানি গ্রন্থ পাঠ না করলে সাহিত্য সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই বইগুলির নাম 'সুস'। এতে কনফুসিয়াসের মতবাদ, তাঁর উপদেশাবলী ও তাঁর জীবনী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আছে।

এর আবার প্রথম বইটার নাম লুন-উ, এতে আছে কনফুসিয়াসের কথোপকথন এবং তাঁর বাণী। দ্বিতীয়টির নাম তা-সিয়ো অর্থাৎ যুবকদের প্রতি উপদেশাবলী—এর মধ্যে আছে অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাবলী—আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি। তৃতীয়টির নাম চাঙ-য়ুঙ অর্থাৎ বিশ্বের সকল জিনিসের মধ্যে কেমন ক'রে সাম্য মৈত্রী ও ছন্দ রক্ষা ক'রে চলতে হয় তার উপদেশাবলী। চতুর্থটির নাম মেঙ্‌ৎসী অর্থাৎ মেঙ নামে যে দার্শনিক ছিলেন তাঁর সম্বন্ধে কনফুসিয়াসের নিজের মতবাদ।

এইগুলি থেকেই ক্রমশঃ চীনের সাহিত্য গড়ে উঠেছে। এবং চীন যে একদিন কত বড় ছিল, শিক্ষায় দীক্ষায় পাণ্ডিত্যে ললিতকলায়, শিল্পে, বাণিজ্যে, তা আমরা—শুধু আমরা কেন, পৃথিবীর সকল দেশের লোকে তাদের এই সাহিত্য থেকে জানতে পারে।

এইবার রোম ও গ্রীসের একটা পৌরাণিক কাহিনী তোমাদের বলবো। বিশ্বসাহিত্যের রত্নসিংহাসনে এই গল্পগুলি আজও হীরার টুকরোর মত জ্বল জ্বল করছে।

হাজার হাজার বছর আগে নার্সিসাস্ ব'লে একটি ছেলে গ্রীসে জন্মেছিল। কিন্তু সে ছেলেটা এমন অদ্ভুত প্রকৃতির ছিল যে, আজও আমরা যখন তখন তার নামের উল্লেখ ক'রে থাকি। কেউ যখন নিজের প্রশংসায় মুখরিত হ'য়ে ওঠে তখন আমরা তার সেই প্রবৃত্তিকে 'নার্সিসাস্ কম্‌প্লেক্স' বলি। কেন বলি তাই বলছি।

নার্সিসাস্ জন্মাবার পর তার মা তাকে একজন সাধুর কাছে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর ছেলে ভবিষ্যতে প্রকৃত মানুষ হ'য়ে উঠতে পারবে কি না?

সাধু বললেন, পারবে, তবে যদি সে নিজেকে কোনদিন চিনতে না পারে।

কথাটা তার মা ঠিক বুঝতে পারলেন না। তখন তিনি অন্য লোকের কাছে গিয়ে সে কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। তারা সকলে কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলে, হেঁয়ালী ব'লে।

তারপর একদিন নার্সিসাস্ বড় হ'য়ে উঠলো।

তখন তার কাজ ছিল তীর ধনুক হাতে নিয়ে সমস্ত দিন বনে বনে ঘুরে বেড়ানো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে শুধু শিকার ক'রে কাটাত। অন্য কোন লোকজনের সহিত বিশেষ মিশত না।

এমন সময় একদিন এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল।

বহুক্ষণ ধরে একটা শিকারের পেছনে বৃথা তাড়া ক'রে ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে নার্সিসাস্ একটা নদীর ধারে গিয়ে ধপ ক'রে বসে পড়লো। ছোট্ট পাহাড়ে নদী। স্বচ্ছ কাকচক্ষুর মত তার জল—কালো

পাথুরে মাটির ওপর আয়নার মত স্থির হ'য়ে ছিল। কিছুক্ষণ একটা গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় বিশ্রাম ক'রে যেমন ধীরে ধীরে নার্সিসাস্ মুখটা নীচু করলে জল পান ক'রবার জন্য, অমনি সে চমকে উঠলো নদীর স্থির জলে তার প্রতিবিম্ব দেখে।

এত সুন্দর তার মুখ! পৃথিবীতে এমন সুন্দর মুখ তো সে আর কখনও কারুর দেখেনি। চুপ করে বসে বসে নার্সিসাস্ সেই কথা ভাবতে লাগল।

একটু পরে সে আবার জলের মধ্যে চেয়ে দেখলে। প্রথমের চেয়ে এবার যেন আরও সুন্দর ব'লে মনে হ'লো তার সেই সুন্দর মুখখানিকে। তখন বার বার সে দেখতে লাগল। কিন্তু যত দেখে তত যেন তার আরও বিস্ময় বেড়ে যায়। আরও সুন্দর মনে হয় তার মুখখানা।

এইভাবে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে নিজে এমন মুগ্ধ হ'য়ে গেল যে, সে অস্থির হয়ে উঠলো তার সঙ্গে কথা কইবার জন্য। নার্সিসাস্ চুপি চুপি একবার কি যেন তাকে বললে। জলের মধ্যে সুন্দর দু'টি ঠোঁট ফাঁক হ'লো যেন তার কথার উত্তর দেবার জন্য, কিন্তু কোন শব্দ তার কানে এলো না।

সে তখন হাসল। তার হাসি দেখে জলের মধ্য থেকে তারার মত সেই সুন্দর চোখ দুটিও জ্বলে উঠলো। নার্সিসাস্ তখন হাত নেড়ে তাকে ডাকলে। সেই অতি প্রিয় ছায়ামূর্ত্তিও যেন তাকে ডাকলে সঙ্গে সঙ্গে। তার পর যত জলের কাছে সে মুখ নিয়ে যায়, ততই যেন সেই সুন্দর মুখটি জলের ওপরদিকে ভেসে উঠতে লাগল।

যেই সে তাকে হাত দিয়ে ধরতে গেল, অমনি কোথায় মিলিয়ে গেল। অর্থাৎ জলে নাড়া লাগতেই ঢেউয়ের আঘাতে সেই প্রতিবিম্বটি চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে গেল। আবার যখন জলটা স্থির হ'লো তখন সেই মুখখানিও ধীরে ধীরে ফুটে উঠলো অপূর্ব্ব লাবণ্যমণ্ডিত হ'য়ে।

বেচারী নার্সিসাস! মানুষ হয়ে শেষে একটা ছায়ামূর্ত্তিকে ভালবেসে ফেললে।

সে আহার নিদ্রা ভুলে গেল। শুধু দিনরাত নদীর ধারে বসে একদৃষ্টে চেয়ে থাকত—নিজের সেই প্রতিবিম্বের দিকে।

সকাল যায়, রাত্রি আসে—তবুও সে নড়ে না সেই জায়গা ছেড়ে। কি দেখে তা সে-ই জানে! নিজের মুখ দেখে দেখে যেন তার আর আশা মেটে না।

এইভাবে না খেয়ে না ঘুমিয়ে দিনরাত বসে থাকতে থাকতে ক্রমশঃ তার দেহ দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ল এবং সে মরে গেল। মরবার আগে শুধু শেষবার এই কথাটি সে উচ্চারণ করলে—হে মোর নিরাশ বন্ধু, বিদায়! তার এই অন্তিম বাণী ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হতে হতে মিলিয়ে গেল—নদীর জলে, পাহাড়ের চূড়ায়, অরণ্যের গভীর অন্তরে!

সেদিন নার্সিসাসের শোকে কাঁদলে অরণ্যের দেবদেবীরা, কাঁদল জলপরীরা। সে ছিল তাদের সকল সময়ের সাথী, বন্ধু! তাই তারা বন্ধুর সেই মৃতদেহের সদ্‌গতি করবার জন্য চিতা সাজাতে লাগল।

এদিকের সব ঠিক ক'রে তারা ফুলের মালা আনতে গেল তাদের বন্ধুর গলায় পরাবে বলে। কিন্তু একি! সেখানে গিয়ে তারা দেখলে মৃতদেহ নেই, কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। আর তার বদলে একটি অতি সুন্দর ফুল জলের ওপর ফুটে আছে—বক্ষে তার সোনার দীপ্তি, চারিপাশে শুভ্র ও অতি সুকোমল অসংখ্য পাপড়ি জলের মধ্যে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে আছে।

হাজার হাজার বছর কেটে গেছে। কিন্তু এখনো স্থির জলাশয়ে যে সুন্দর ফুলটি ফুটে থাকে, তার নিজের ছায়ার দিকে চেয়ে—তাকে সবাই ডাকে নার্সিসাস ব'লে।

পঞ্চতন্ত্র

সে অনেক দিনের কথা। ভারতবর্ষের দক্ষিণে মহিলারোপ্য নগরে এক রাজা রাজত্ব করতেন, তাঁর নাম অমরশক্তি। তিনি যেমন দয়ালু তেমনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু তাঁর যে তিনটি ছেলে ছিল তারা একেবারে মূর্খ—লেখাপড়া একদম তাদের মাথায় ঢুকত না। যা পড়তো সঙ্গে সঙ্গে সব ভুলে যেত। ছেলে তিনটির নাম বসুশক্তি, উগ্রশক্তি আর অনেকশক্তি।

রাজার মনে বড় দুঃখ। তিনি একদিন মন্ত্রীদের ডেকে বললেন, আমার এত বড় রাজ্য, এত ধনদৌলত, কিন্তু মনে এতটুকু সুখ নেই! এই মূর্খ ছেলেগুলির দিকে চাইলে আমার বুকের ভেতরটা ফেটে যায়। কি হবে তাদের ভবিষ্যৎ ভেবে পাই না। আপনারা সকলে মিলে যদি এখন একটা কোন উপায় ঠিক ক'রে দেন তো, ছেলেদের হয়ত জ্ঞানবুদ্ধি কিছু হ'তে পারে।

মন্ত্রীরা অনেক ভেবে চিন্তে কিছু করতে না পেরে দায়িত্বটা নিজেদের ঘাড় থেকে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। তাঁরা বললেন, মহারাজ, আপনার রাজ্যে পাঁচশো পণ্ডিত রয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেককে আপনি মাসোহারা দিয়ে পুষছেন, এ ভার তাঁদের ওপর আপনার দেওয়া উচিত।

কথাটা রাজার মন্দ লাগল না। তিনি তৎক্ষণাৎ পণ্ডিতদের ডেকে পাঠালেন।

রাজা ডেকেছেন! পণ্ডিতরা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। তখন রাজা তাঁর মনের কথা তাঁদের সকলকে খুলে বললেন।

পণ্ডিতেরা সব শুনে বললেন, মহারাজ, লেখাপড়া শেখানো এত তাড়াতাড়ির কাজ নয়। সমস্ত শিক্ষার পূর্ব্বে শুধু বারো বছর ব্যাকরণ মুখস্থ করতে হবে, তবে আপনার ছেলেরা মনু, চাণক্য, বাৎস্যায়নাদি

শাস্ত্রের অর্থ উপলব্ধি করতে পারবে। তারপর ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি প্রভৃতিতে পাণ্ডিত্য লাভ করবার কথা উঠবে। এইভাবে অনেকে অনেক মতামত প্রকাশ করলেন। শেষে একজন পণ্ডিত বললেন, মহারাজ, জীবন ক্ষণস্থায়ী অথচ শব্দশাস্ত্র অগাধ। কাজেই তাতে জ্ঞান লাভ করতে গেলে দীর্ঘ সময় লাগবে আবার তার মধ্যে কত বাধা, কত বিঘ্ন হয়ত এসে পড়বে। আমি বলি, কাজ কি এত দায়িত্বের মধ্যে গিয়ে? তার চেয়ে বিষ্ণুশর্ম্মা নামে এখানে যে পণ্ডিত আছেন, ছাত্র মহলে তাঁর নাম-ডাক খুব, তাঁর হাতে যদি রাজপুত্রদের শিক্ষার ভার তুলে দেন তো, আমার মনে হয় অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আপনার ছেলেদের সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ক'রে দিতে পারবেন।

কথাটা রাজার মনে খুব লাগল। তিনি তখনই বিষ্ণুশর্ম্মাকে ডেকে পাঠালেন।

বিষ্ণুশর্ম্মা আসতেই রাজা তাঁকে বসবার আসন দিয়ে বললেন, হে পণ্ডিতপ্রবর, আমার ছেলে তিনটিকে যদি অল্পদিনের মধ্যে আপনি সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত ক'রে দিতে পারেন তো, একশো গ্রাম আমি আপনাকে দান করবো।

এই কথা শুনে বিষ্ণুশর্ম্মার মনে ভারি রাগ হ'লো। তিনি বললেন, মহারাজ, আমি বিদ্যা বিক্রয় করি না, আমায় লোভ দেখাবেন না। কেন না অর্থে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমার আশি বছর বয়স হয়েছে—পৃথিবীর প্রায় সকল রকমের ভোগবাসনা লোপ পেয়েছে। তবে আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করবার জন্য আমি মা সরস্বতীর আরাধনা করবো এবং আজ থেকে ছ'মাসের মধ্যে যদি রাজপুত্রদের সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত না ক'রে দিতে পারি তো, আমার নাম ত্যাগ করবো—এই প্রতিজ্ঞা করলুম।

রাজা বিষ্ণুশর্ম্মার মুখ থেকে এই কথা শুনে একসঙ্গে বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ ছেলেদের ডেকে এনে তাঁর হাতে

সঁপে দিলেন।

বিষ্ণুশর্ম্মা তখন পাঁচটি তন্ত্র কাব্য রচনা ক'রে রাজপুত্রদের নিয়মিত পড়াতে লাগলেন। সত্যিসত্যিই সেগুলি পাঠ ক'রে ছ'মাসের মধ্যে তারা নীতিশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত হ'য়ে উঠলো।

এইভাবে পঞ্চতন্ত্রের সৃষ্টি হ'লো। এবং সেই দিন থেকে ক্রমশঃ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো তার খ্যাতি।

সংস্কৃত সাহিত্যে পঞ্চতন্ত্রের স্থান অতি উচ্চে। এই ছোট ছোট সরস গল্পগুলি যে ঠিক কবে রচিত হয়েছিল তা এখনো সঠিক জানা যায় না। তবে পৃথিবীর বহু ভাষাতে এর অনুবাদ হয়েছে। বড় হ'লে তোমরা সে কথা ভাল ক'রে জানতে পারবে। কেউ কেউ বলেন, ঈশপের গল্পগুলি নাকি পঞ্চতন্ত্রেরই ছায়া অবলম্বনে রচিত।

এখানে শুধু তোমাদের সেই অতি-বিখ্যাত পঞ্চতন্ত্র থেকে একটা গল্প শোনাবো। গল্পটির নাম মাতৃ আজ্ঞা।

পুরাকালে কোন এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন, তাঁর নাম ছিল ব্রহ্মদত্ত। একদিন বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষে তিনি বিদেশে যাচ্ছিলেন এমন সময় তাঁর মা এসে বললেন, বাবা তোমায় একলা আমি বিদেশে কিছুতেই যেতে দেবো না—অন্ততঃ একজন সঙ্গী নিয়ে যেতেই হবে।

এখনকার মত তখন গাড়ী ঘোড়ার এত সুবিধা ছিল না। কোথাও যেতে হ'লে হেঁটে যেতে হ'তো এবং পথে বিপদ আপদের সম্ভাবনা তো থাকতই।

ব্রাহ্মণ তখন ভারি মুস্কিলে পড়লেন। শেষে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে মাকে বললেন, পথে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই, আমি যেখান দিয়ে যাব অনবরত সে পথ দিয়ে লোক যাতায়াত করে, কাজেই সঙ্গী না নিলেও ক্ষতি নেই।

মা যখন দেখলেন ছেলে একলা যাবেই, তখন তিনি পুকুর থেকে একটা কাঁকড়া ধরে এনে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, বাছা, যদি নিতান্তই একলা যেতে হয় তো এই কাঁকড়াটিকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি বুড়োমানুষ, আমার কথা শুনলে ভাল হবে—কাজেই অমত ক'রো না। একলা কোথাও যেতে নেই অথচ এই সামান্য কাঁকড়াটি তাঁর কি উপকারে লাগতে পারে ব্রাহ্মণ তখন অবাক হ'য়ে তাই ভাবতে লাগলেন! যাই হোক, মায়ের আদেশ শিরোধার্য্য মনে ক'রে তার কোন প্রতিবাদ করলেন না। কাঁকড়াটিকে একটি কৌটায় বন্ধ ক'রে থলের মধ্যে পুরে ব্রাহ্মণ বাড়ী থেকে যাত্রা করলেন। সেই কৌটোটায় কর্পূর ছিল, পথ চলতে চলতে তার তীব্র গন্ধ তাঁর নাকে আসতে লাগল।

পথ আর ফুরোয় না। ব্রাহ্মণ চলছেন তো চলছেন,—কত মাঠ, কত গ্রাম কত নদী পেরিয়ে গেল। ক্রমে বেলা যত বাড়তে লাগল, রোদ্দুরের তেজও তত প্রখর হ'য়ে উঠলো। পথশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে তখন ব্রাহ্মণ একটা গাছের তলায় বসে পড়লেন। গাছের ছায়ায় তাঁর শ্রান্তি দূর হ'লো কিন্তু মেঠো হাওয়া গায়ে লেগে ঘুমে তাঁর চোখ জুড়ে এলো। তিনি পুঁটুলিটি মাথার কাছে রেখে, গাছের তলায় শুয়ে গভীর নিদ্রা যেতে লাগলেন।

এমন সময় হ'লো কি, একটা প্রকাণ্ড কেউটে সাপ সেই গাছের গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। ব্রাহ্মণের তখন নাক ডাকছে—ঘুমে তিনি অচৈতন্য।

সর্ব্বনাশ! সাপটা এঁকে বেঁকে একেবারে তাঁর মাথার কাছে গিয়ে পড়লো। কিন্তু কর্পূরের গন্ধ নাকে যেতেই সে থমকে দাঁড়াল।

সাপেরা কর্পূর ভয়ানক ভালবাসে, তাই অন্য কোন দিকে না চেয়ে সাপটি একেবারে থলির মধ্যে গিয়ে ঢুকল এবং সেই কর্পূরের কৌটোটিকে একসঙ্গে গিলে ফেললে।

যেমন গেলা আর যায় কোথায়। সেই কাঁকড়াটি তার দাঁড়া দিয়ে এমনভাবে সাপটাকে কামড়ে ধরলে যে সাপটা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে করতে তখনি মারা গেল।

কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণের ঘুম ভাঙল। তিনি মাথার কাছে সাপটিকে দেখে ভয়ে ধড়মড় ক'রে উঠে বসলেন। তারপর যখন দেখলেন, সাপটি মরে গেছে তখন মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভেবে দেখলেন যে, সেই তুচ্ছ কাঁকড়াটির জন্যই সেদিন তাঁর জীবন রক্ষা হ'লো! তৎক্ষণাৎ তাঁর মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি সেখান থেকে মায়ের শ্রীচরণের উদ্দেশে বার বার নমস্কার করলেন।

ভাগ্যিস মায়ের কথা শুনেছিলেন, সেই জন্যই তো সেদিন ব্রাহ্মণের প্রাণটা বেঁচে গেল।

জাতকের গল্প

এ কথা তোমরা সকলেই জান যে আজ থেকে আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভগবান বুদ্ধদেব কপিলাবস্তু নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাজা শুদ্ধোদনের পুত্ররূপে। কিন্তু বৌদ্ধদের মতে ভগবান বুদ্ধদেব এই প্রথম নয়, এর আগেও বহুবার নাকি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই পৃথিবীতে। তাঁদের বিশ্বাস, মানুষ এক জন্মে কখনো এমন দেবত্ব লাভ করতে পারে না—বহু জন্মের বহু পুণ্যফলে তবে ধীরে ধীরে এই স্তরে উন্নীত হয়। তাই তাঁরা ভগবান বুদ্ধের এই অতীত জীবনবৃত্তান্ত-গুলিকে জাতক আখ্যা দিয়েছেন। আজ আমি তোমাদের কাছে সেই জাতকের গল্প থেকে একটি বলবো।

হাজার হাজার বছর পূর্ব্বে একবার ভগবান বুদ্ধ এ স্থানে ফেরিওয়ালা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম ছিল সেরিবান। ঐ স্থানে সেরিবা নামে আরো একজন ফেরিওয়ালা ছিল। অর্থে তার

এত বেশী লোভ ছিল যে লোককে ঠকিয়ে অল্পমূল্যের জিনিস বেশী দামে বিক্রি করতো।

কিন্তু সেরিবান ঠিক ঠিক দামে তার জিনিস বিক্রি করতো। লোককে ঠকাবার কথা কখনো তার মনে কোন দিন আসতো না। তাই সবাই সেরিবানের কাছ থেকে জিনিস কিনত; সেরিবার কাছে কিনত না।

এদিকে দিন দিন বিক্রি কমে যাচ্ছে দেখে সেরিবা অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়লো। সে তখন সেরিবানকে ডেকে বললে, আজ থেকে আমরা দু'জনে দুদিকে ফেরি করতে যাবো, তা না হ'লে আমরা কেউ লাভবান হ'তে পারবো না এবং একদিন হয়ত দুজনেরই ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে! এই বলে অনেক বুঝিয়ে সেরিবা তাকে ভবিষ্যত সম্বন্ধে সর্তক ক'রে দিলে।

সেরিবান দেখলে কথাটা সেরিবা অন্যায় বলেনি। তাই সেইদিন থেকে তারা দু'জনে দুই ভিন্ন গ্রামে ফেরি করতে লাগল। যেদিকে সেরিবান যায়, সেরিবা সেদিকে যায় না। আর যেদিকে সেরিবা যায় সেদিকে সেরিবান যায় না।

কিন্তু এইভাবে দিন কতক কাটবার পর সেরিবা ভাবল কাজটা ঠিক হয়নি। সেরিবান হয়ত তার চেয়ে অনেক বেশী লাভ করছে! যদি সেরিবান যেখানে ফেরি করে সেখানে সে যেত তা হ'লে হয়ত ভাল করতো। তাই আবার একদিন সেরিবানকে ডেকে সে বললে, কাজ নেই ভাই ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে গিয়ে, আজ থেকে আমরা দু'জনে দুরকম জিনিস নিয়ে একই গ্রামে গিয়ে ফেরি করবো। তা হ'লে দু'জনেই নিশ্চয় খুব লাভ করতে পারব।

কথাটা এবারেও সেরিবানের কাছে ভালই মনে হ'লো। সে তাতেই রাজী হ'লো। এবং পরদিন থেকে দু'জনে এক সঙ্গে কাজ করতে লাগল।

একদিন দু'জনে একটি নদী পার হ'য়ে বহু দূরবর্ত্তী এক গ্রামে

জিনিস বিক্রি করতে গেল। সেরিবা এক রাস্তা ধরলে। সেরিবান আর এক রাস্তা ধরলে। এইভাবে গ্রামের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তারা জিনিস ফেরি করতে লাগল।

সেরিবা একটি পুরানো ভাঙা বাড়ীর সামনে গিয়ে যেমন হাঁকল, 'মনিহারী জিনিস চাই গো' অমনি একটি ছোট মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেল বাড়ীর ভিতরে। এবং একটি পুতুল কিনে দেবার জন্য তার ঠাকুমার কাছে বায়না ধরল।

মেয়েটি জানত যে তারা গরীব, কোন দিন একবেলা খাওয়া জোটে কোনদিন আবার তাও জোটে না। তবুও কিন্তু সে এই পুতুলটির লোভ সামলাতে পারলে না, ঠাকুমার কাছে পয়সা চাইতে লাগল।

বুড়ীর নয়নের নিধি এহ নাতনীটি! তাই কেমন ক'রে সেই পুতুলটি তাকে কিনে দেবেন এই কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল যে, ভাঙা সিন্দুকের মধ্যে বহু দিনের একটা পুরানো জরদার কৌটো পড়ে আছে। সেইটার বদলে ফেরিওয়ালা যদি এই পুতুলটা দেয়—এই মনে করে বুড়ী তখনি কৌটোটা বরে ক'রে এনে তাকে দেখালেন।

সেরিবা দেখবামাত্র চিনতে পারলে যে কৌটোটা সোনার এবং তাতে হীরামুক্তোর কাজ করা রয়েছে। তবে বহুদিন অযত্নে পড়ে থাকার দরুন ধূলো ও ময়লা লেগে বিবর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু অত্যধিক লোভের আশায় সে বৃদ্ধাকে বললে, মা, এর আর কি দাম হবে, এক পয়সা কি দেড় পয়সা। অথচ আমার এই পুতুলটার দাম চার আনা। কাজেই কৌটোর বদলে কেমন ক'রে এই পুতুলটা দেবো মা? তার চেয়ে বরং দেড়টা পয়সা নিয়ে কৌটোটা আমায় বিক্রি করে দিন, তাতে আপনার সুবিধা হবে।

বুড়ী বললেন, আমার নাতনীর যদি পুতুল কেনা নাই হ'লো

তবে দেড় পয়সার জন্য এটা বিক্রি ক'রে লাভ কি ? তবু একটা জিনিস ঘরে আছে, থাক্।

সেরিবা তখন ভাবলে, এখনই যদি এর দাম আর কিছু বাড়িয়ে দেয় তাহ'লে বুড়ী হয়ত মনে করবে জিনিসটার দাম সত্যিসত্যিই খুব বেশী। তাই ফেরবার পথে আর একবার এসে মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে কৌটোটা কিনে নিয়ে যাবে, এই মনে ক'রে সে তখনকার মত সেখান থেকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সেরিবানও ফেরি করতে করতে সেই পথে এসে পড়লো। মেয়েটি তাকেও দেখতে পেয়ে ডেকে নিয়ে গেল বাড়ীর মধ্যে। এবং এবার একজোড়া চুড়ি কিনে দেবার জন্য ঠাকুমাকে ভয়ানক পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

অগত্যা বুড়ী আবার সেই কৌটোটা এনে তার হাতে দিয়ে বললে, দেখ বাছা, এর বদলে যদি দু'গাছা চুড়ি দিতে পার দাও—না হ'লে চলে যাও, আমার কাছে একটিও পয়সা নেই।

সেরিবান সেই কৌটোটা দেখে বুড়ীকে বললে, মা, এ যে অতি মূল্যবান জিনিস, সোনা ও হীরেমুক্তো দিয়ে তৈরি। এর দাম কমের পক্ষেও এক হাজার টাকা হবে। আমার কাছে এখন মোট পাঁচশো টাকা আছে, কাজেই আমি কি ক'রে এটা কিনবো বলুন ?

তিন পুরুষ আগে বুড়ীদের অবস্থা খুব ভাল ছিল এবং তখন থেকেই সেই কৌটোটা অযত্নে বাক্সর মধ্যে পড়ে থেকে অমন ছাতা ধরে গিয়েছিল। তাই বুড়ী মনে করেছিল, বুঝি ওটা পেতলের জিনিস। কিন্তু সেরিবানের মুখ থেকে ঐ কথা শুনে বুড়ী বললে, কিছুক্ষণ আগে আর একজন ফেরিওয়ালা এসে এর দাম বলে গেল দেড় পয়সা, অথচ একটু সময়ের মধ্যে যদি এটা সোনায় পরিণত হ'য়ে এত মূল্যবান হ'য়ে থাকে তো, সে তোমার হাতের স্পর্শেই হয়েছে। কাজেই তোমার

কাছে যা আছে তাই দিলেই আমার যথেষ্ট হবে। তার চেয়ে বেশী আমি চাই না।

তখন সেরিবান কোমরে বাঁধা গেঁজে থেকে পাঁচশো টাকা গুণে দিয়ে তাঁর কাছ থেকে কৌটোটা কিনে নিলে এবং সেই চুড়ি দু'গাছা মেয়েটির হাতে পড়িয়ে দিয়ে একেবারে নদীর ঘাটে গিয়ে হাজির হ'ল।

এদিকে সেরিবা—সেই আগের ফেরিওয়ালাটি, লোভ সামলাতে না পেরে এদিক ওদিক থেকে কিছুক্ষণ ঘুরে এসে আবার বুড়ীকে ডেকে বললে, আচ্ছা মা, আরো দু'পয়সা না হয় বেশী দিচ্ছি, কৌটোটা আমায় দিয়ে দিন।

বুড়ী বললে, সে কৌটোটা তো আমার কাছে নেই। এইমাত্র বোধ হয় দশ মিনিট আগে, আর একজন ফেরিওয়ালাকে বিক্রী ক'রে দিয়েছি পাঁচশো টাকায়।

আর একজন ফেরিওয়ালা বলতেই, সেরিবা চমকে উঠলো। এবং সে যে সেরিবান ছাড়া আর কেউ নয় একথা বুঝতেও তার দেরি হ'লো না। তাই আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে সে তখন হায় হায় করতে করতে ছুটলো সেই নদীর দিকে। যদি এখনো তাকে পথে ধরতে পারে, তাহলে পাঁচশো টাকা দিয়ে কোন রকমে তার কাছ থেকে কৌটোটা ফিরিয়ে নেবে। এটা তার প্রাপ্য! সে আগে দেখে দর-দাম ক'রে গিয়েছিল।

নদীতে মাত্র একখানি নৌকো খেয়া দেয়। সেরিবানকে নিয়ে সেই নৌকোটা যখন মাঝ নদীতে চলে গিয়েছে, এমন সময় সেরিবা ঘাটে এসে উপস্থিত হ'লো এবং 'নৌকো ভিড়োও' নৌকো ভিড়োও' বলে পাগলের মত চীৎকার করতে করতে যেমন সে ছুটে গেল নদীর কিনারায় অমনি পা ফস্কে একেবারে গভীর জলে পড়ে গেল। সে সাঁতার জানত না। খরস্রোতা নদীর মধ্যে পড়ে যে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কেউ তা জানতেও পারলে না।

সেরিবান বা মাঝি কারুর কানে সে ডাক গিয়ে পৌঁছল না, তারা তাদের গন্তব্য স্থানে চলে গেল।

এদিকে কয়েকদিন পরে ঘাট থেকে বহুদূরে জেলেদের জালে একটা মৃতদেহ উঠলো। পচে ফুলে তা থেকে দুর্গন্ধ বেরচ্ছিল। জেলেরা তখন সেটাকে টান মেরে ফেলে দিল একটা কাঁটা বনে। শেয়াল কুকুরে তার মাংস ছিঁড়েখুঁড়ে খেতে লাগল।

এই ভাবে লোককে ঠকাতে গিয়ে সেরিবার মৃত্যু হ'লো। আর সেরিবান—সেই নির্লোভ ফেরিওয়ালাটি কৌটোটা বিক্রি ক'রে বহু টাকা লাভ করলে এবং সুখেস্বচ্ছন্দে সংসার করতে লাগল।

ঈশপের গল্প

পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলির সঙ্গে ঈশপের গল্পগুলির এত মিল আছে যে, অনেকে মনে করেন এগুলি তারই অনুকরণে লেখা। কিন্তু একথা জোর করে বলা যেতে পারে যে, অনুকরণ হোক্ বা না হোক্ এই গল্পগুলি ভারি সুন্দর। ভাব যেমন গভীর, ভাষা তেমনি সহজ ও সরল। অথচ প্রত্যেকটির মধ্যে কিছু না কিছু মুল্যবান উপদেশ আছে। তাই এই নীতিমূলক গল্পগুলি বিশ্বসাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ।

তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে যে, এই ঈশপ ছিলেন একজন সামান্য ক্রীতদাস, জাতিতে গ্রীক। খৃষ্ট জন্মাবার দু'শ বছর পূর্ব্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তখনকার দিনে ইউরোপের বহু স্থানে বিশেষতঃ রোম ও গ্রীসে ক্রীতদাস প্রথা খুব প্রচলিত ছিল। চাকর বাজারে বিক্রী হ'ত আলু পটলের মত, ধনীরা পয়সা দিয়ে তাদের কিনতেন। এই সব ক্রীতদাসরা চিরকালের মত তাদের মনিবের সম্পত্তি হ'য়ে থাকত।

আর মনিবরা তাদের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করতেন। ক্রীতদাসদের ওপর তখন যে বহু নৃশংস অত্যাচার হ'ত—তার অসংখ্য কাহিনী তখনকার দিনের ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায়।

তবে সবসময়েই যে অত্যাচার হ'ত তা নয়। মনিব ভাল হ'লে চাকরও ভাল ব্যবহার পেত। কেউ কেউ আবার ওরই মধ্যে থেকে লেখাপড়া শিখে অথবা অন্য কোন উপায়ে মনিবকে খুশী ক'রে, নিজেদের চেষ্টায় নিজেরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করতো।

শোনা যায়, ঈশপ এই ভাবে নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে প্রচুর জ্ঞানার্জ্জন করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন। ঈশপের সম্বন্ধে আরো অনেক রকম গল্প প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন তিনি নাকি বিকলাঙ্গ ও কুৎসিত-দর্শন ছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, এই রকম বিকৃত দেহ ও বিকৃত মন নিয়ে কোন লেখক এত সুন্দর গল্প রচনা করতে পারে না। যাক্, তাঁকে দেখতে সুন্দর ছিল কি কুৎসিত ছিল, তা নিয়ে সাহিত্যের কিছু এসে যায় না। কেননা তিনি যে সাহিত্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন তা চির-সুন্দর ও চিরস্থায়ী। তার প্রমাণ বোধ হয় তোমরা এতদিনে পেয়েছো—স্কুলে নিশ্চয়ই তোমরা কিছু না কিছু তাঁর লেখা পড়েছো। কেননা ঈশপের গল্প প্রতি দেশের প্রতি স্কুলের ছেলেমেয়েদের পড়ানো হয়। আর যাদের সে সৌভাগ্য এখনো হয়নি তাদের জন্য আমি এখানে একটি গল্প বলছি।

কোন এক বনে এক কাঠুরিয়া রোজ কাঠ কাটতে যেতো। ভারি গরীব সে। দৈনিক কাঠ বিক্রি ক'রে যা রোজগার করতো তাই দিয়ে কোন রকমে খেয়ে-প'রে দিন চলতো। একদিন এক নদীর ধারে সে গেল কাঠ কাটতে। সেখানে গিয়ে একটা গাছে যে-ই কুড়ুল দিয়ে ঘা মেরেছে, অমনি তার হাত ফসকে কুড়ুলটা গভীর জলের মধ্যে পড়ে গেল। খরস্রোতা নদী। তাছাড়া জলজন্তুর ভয় ছিল তাতে ভয়ানক।

তাই নিরুপায় হ'য়ে কাঠুরিয়া সেই গাছের গোড়ায় বসে তখন কাঁদতে লাগল।

এত গরীব সে যে তার আবার একটা কুড়ুল কেনবার মত সঙ্গতি ছিল না। তাই কি উপায় করবে, গাছের গোড়ায় বসে বসে ভাবতে লাগল। আর যত ভাবে তত চোখ দিয়ে জল পড়ে।

এমনি করে কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর হঠাৎ এক জলদেবতা জলের মধ্যে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কাঁদছ কেন?

কাঠুরিয়া বললে, আমি বড় গরীব, আমার কুড়ুলটা জলে পড়ে গেছে তাই কাঁদছি।

জলদেবতা বললে, আচ্ছা তোমার কুড়ুল আমি এনে দিচ্ছি, তুমি কোঁদো না।

এই বলে তৎক্ষণাৎ জলে ডুব দিয়ে একখানা সোনার কুড়ুল তুলে এনে তাকে দেখিয়ে জলদেবতা জিজ্ঞাসা করলেন, এইটে কি তোমার?

কাঠুরিয়া ভাল করে দেখে বলল, না।

সঙ্গে সঙ্গে আবার জলের মধ্যে ডুব দিয়ে আর একটা রূপোর কুড়ুল নিয়ে এসে জলদেবতা জিজ্ঞাসা করলেন, তবে এইটা কি তোমার?

এবারও কাঠুরিয়া বিশেষভাবে পরীক্ষা করে বললে, না এটাও নয়।

তখন জলদেবতা সেখানে ডুব দিয়ে আর একটা লোহার কুড়ুল এনে তাকে দেখালেন। কাঠুরিয়া এতক্ষণ পরে নিজের কুড়ুলখানি চিনতে পেরে সাগ্রহে বলে উঠলো, হ্যাঁ, এইটেই আমার।

জলদেবতা কাঠুরিয়ার এই সততা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং তাকে তার নিজের কুড়ুলটি তো ফিরিয়ে দিলেনই উপরন্তু সেই সোনার ও রূপোর কুড়ুল দুটি উপহার দিয়ে জলের মধ্যে আবার অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

এতখানি সোনা ও রূপো পেয়ে কাঠুরিয়ার অবস্থা ফিরে গেল।

কেননা সেই দু'টি বাজারে বিক্রী ক'রে সে যা টাকা পেল তাতেই তার দিন কাটতে লাগল খুব সুখে স্বচ্ছন্দে।

এদিকে হ'লো কি, এই গল্পটি তার মুখ থেকে শোনবার পর আর একজন কাঠুরিয়ার মনে বড় লোভ জন্মাল। সে একদিন চুপি চুপি সেই নদীর ধারে গাছ কাটতে গিয়ে ইচ্ছা ক'রে তার কুড়ুলটা জলের মধ্যে ফেলে দিল। তারপর সেখানে বসে বসে কাঁদতে লাগল।

তার কান্না শুনে আবার সেই জলদেবতাটি সেখানে আবির্ভূত হলেন এবং পূর্ব্বের মত এবারও প্রথমে একটি সোনার কুড়ুল তুলে ধরে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি তোমার?

সূর্য্যের আলো লেগে সোনার কুড়ুলটি ঝলমল ক'রে জ্বলে উঠল; আর তাই দেখে কাঠুরিয়ার চোখদু'টি এমন লুব্ধ হ'য়ে উঠল যে সে সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেললে, হ্যাঁ এইটা আমার।

তৎক্ষণাৎ জলদেবতা টুপ করে সেখানে ডুব দিয়ে কোথায় চলে গেলেন আর উঠলেন না।

তখন সেই কাঠুরিয়াটি হায় হায় করতে লাগল এবং নিজের কপালে নিজে চড় মারতে মারতে বলল, হায়! হায়! কেন মিথ্যে কথা বলতে গেলুম, তাই তো আমার এমন শাস্তি হ'লো! সোনার রূপোর কুড়ুল পাওয়া দূরে থাক, নিজের যে লোহার কুড়ুলটি ছিল তাকে পর্য্যন্ত হারালুম।

বাইবেল

আমাদের দেশে যেমন রামায়ণ ও মহাভারত সবচেয়ে বিখ্যাত বই ইউরোপের তেমনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হ'লো 'বাইবেল'। ইংরাজী সাহিত্যে এর স্থান সকলের ওপরে।

'বাইবেল' কথাটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রীক ভাষা থেকে। এর অর্থ

হ'লো বই। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে পুরাকাল থেকেই পাঠকেরা এই বাইবেলকে একটি মহাগ্রন্থ ব'লে মনে করতো। কত যুগ কেটে গেছে, তবু আজো এই বইটির মূল্য কিছুমাত্র কমেনি, বরং যত দিন যাচ্ছে ততই বাড়ছে। বাইবেলের মত আর কোন বই ওদেশের মানুষের মনে এতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, ফলে আজ পর্য্যন্ত তাঁর অন্তর্নিহিত সত্য অচল অটল হ'য়ে আছে তাদের সকলের মনে।

সবাই জানে বাইবেল একখানি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ। অবশ্য নাম এক হ'লেও এর মধ্যে আসলে আছে দু'খানি গ্রন্থ। এবং এদের মধ্যে আবার একখানির চেয়ে আর একখানি বেশী পুরাতন। পুরাতনখানির নাম 'ওল্ড টেষ্টামেণ্ট'। প্রাচীনকালের ইহুদীদের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে তাতে। আর নূতন অংশটির নাম 'নিউ টেষ্টামেণ্ট'। যীশুখৃষ্ট জন্মাবার পর থেকে এর শুরু—সে প্রায় উনিশ শ' বছর পূর্ব্বের কথা। এবং এই দুটি বইয়ের সমষ্টি নিয়েই বাইবেল রচিত।

যীশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করবার বহু পূর্ব্ব থেকেই ইহুদীরা লেখাপড়া জানত। তখনও তাদের বহু ধর্ম্মগ্রন্থ ছিল, আর তারা সবাই তাই পড়তো। এই সব গ্রন্থ সর্ব্বপ্রথম লিখিত হয় হিব্রু ভাষায়। কিন্তু খৃষ্ট জন্মাবার বহু পূর্ব্ব থেকেই এই ভাষা তাদের কাছে অত্যন্ত কঠিন ও একঘেয়ে মনে হ'তে শুরু করেছিল। ফলে খৃষ্ট জন্মাবার প্রায় দু'শো বছর আগেই সেই প্রাচীন হিব্রু গ্রন্থগুলি গ্রীক ভাষায় অনূদিত হয়।

কেননা তখন পণ্ডিতদের ভাষা ছিল গ্রীক। আর এই অনুবাদ করা থেকেই প্রথম সূত্রপাত হয় অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করা।

সেই সময় থেকে একটু একটু ক'রে অনুবাদ হ'তে হ'তে আজ অতি সুন্দর ইংরাজী অনুবাদে এসে পরিণত হ'য়েছে। এখন যেটা পাওয়া যায় এর থেকেও সরল অনুবাদ বার করার চেষ্টা চলছে কিছুদিন থেকে।

সেই সুদূর অতীতে কেমন ক'রে ইহুদীরা তাদের বাইবেল রচনা করেছিল এইবার সেই কথা বলবো। বাইবেল রচনা করবার সময় ইহুদীরা সমসাময়িক প্রাচীন সাহিত্য থেকে অতি সাবধানে সংগ্রহ করেছিল সেই সব গ্রন্থ, যাতে মানুষের জীবন ও ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে ভাল ভাল কথা লিখিত আছে। আহরণ করবার পর তারা সেইগুলিকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করলে।

প্রথম হ'লো 'The Law' অর্থাৎ পুরাতন পৃথিবীর বিবরণ। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ভবিষ্যদ্বক্তা ও সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষদের জীবনচরিত। তার মধ্যে জোসুয়া, ইসায়া ও জেরেমিয়ার নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর তৃতীয় খণ্ডে আছে পবিত্র রচনাবলী যথা স্তোত্র, মন্ত্র, প্রবাদ এবং গভীর-ভাবসম্পন্ন বহু সুন্দর সুন্দর কবিতা।

সর্ব্বসমেত 'ওল্ড টেষ্টামেণ্ট'-এ উনআছে চল্লিশটি বই এবং এই বই-গুলির সমষ্টি যে পৃথিবীর এক অত্যাশ্চর্য্য সাহিত্য-সঞ্চয়ন তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

'নিউ টেষ্টামেণ্ট' 'ওল্ড টেষ্টামেণ্ট'-এর চেয়ে আকারে ছোট। এতে আছে মোট সাতাশখানি বই। তার মধ্যে প্রথম চারখানিতে আছে ভগবান যীশুখৃষ্ট যে সব বাণী প্রচার করেছিলেন এই পৃথিবীতে—সেই-গুলি। পরবর্ত্তী বইখানিতে আছে তাঁর শিষ্যবৃন্দের কার্য্যকলাপ, বিশেষ ক'রে প্রধান শিষ্য পলের। তারপর হ'লো একুশখানি ছোট ছোট বই —প্রাচীন খৃষ্টানদের ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল কথাগুলি তাতে লেখা আছে।

এই 'নিউ টেষ্টামেণ্ট'-এর শেষ বইখানি সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। স্বপ্নে দেখা কতকগুলি দৃশ্য এর মধ্যে প্রদীপ্ত ভাষায় বর্ণিত হ'য়েছে। একে বলে দৈববাণীর বই। এখানি রচনা করেছেন জন—যীশুর প্রিয়তম শিষ্য।

'নিউ টেষ্টামেণ্ট'-এর এই সমস্ত বইগুলি প্রথম গ্রীক ভাষায় লিখিত হয়। কারণ গ্রীক ভাষাই খৃষ্টজন্মের সময়ে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে

প্রচলিত ছিল। কিন্তু প্রায় চারশ' বছর পরে জেরোম নামে এক সাধু ল্যাটিনে এর একটি অনুবাদ করেন। সেই সময় আবার ল্যাটিনই হয়েছিল সবাইকার কথ্য ভাষা।

যা-হোক্ এখন দেখা যাচ্ছে যে বাইবেল হ'লো কতকগুলি বইয়ের সমষ্টি অথবা কতকগুলি বইয়ের দু'টি সংগ্রহ। যার একটির সঙ্গে আর একটির দীর্ঘ ব্যবধান—আকৃতিতে, বিষয়বস্তুতে, সময়ে ও ভাষায়। কিন্তু এত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের উভয়ের মধ্যে এমন একটি বলিষ্ঠ ও সুন্দর ভাবধারা বর্ত্তমান যে বস্তুত তাদের সবগুলিকে একটা অখণ্ড জিনিস বলেই মনে হয়। আর এই বইগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা হ'লো এই যে, ভগবান এক এবং সুন্দর!

প্রাচীন ইহুদীদের মধ্যে এই বিশ্বাস ছিল খুব প্রবল। তাই প্রায়ই তাদের সঙ্গে নিকটবর্ত্তী অপর জাতি-সমূহের সংঘর্ষ বাধতো। কেন না অন্য জাতিরা তখন বহু দেবতার পূজা করতো।

বাইবেলের একটা প্রধান উপদেশ হ'চ্ছে সৎ ও ধার্ম্মিক হ'য়ে পৃথিবীতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা। প্রাচীন সন্ন্যাসীরা সেই কথাই বার বার প্রচার করেছিলেন। ভগবান যীশুখৃষ্টের জীবন হ'লো তারই জ্বলন্ত উদাহরণ। 'ওল্ড টেষ্টামেণ্টে' এই কল্পনাই প্রবল ভাবে প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। এবং 'নিউ টেষ্টামেণ্টে' তার আলো আরো শান্ত ও মৃদু, আরো চিত্তাকর্ষক হ'য়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু সে যাই হোক, উভয়ের মূলকথা হ'লো এক।

এ ছাড়া আরো অনেক মহৎ কল্পনা বাইবেলকে সুন্দর করেছে, মধুর করেছে, পবিত্র করেছে। বিশ্বসাহিত্যে এ রকম গ্রন্থ খুব অল্পই আছে।

'ভার্জ্জিল ও ইনিড'

খৃষ্ট জন্মাবার সত্তর বৎসর পূর্ব্বে, ১৫ই অক্টোবর তারিখে ভার্জ্জিলের জন্ম হয়—হোমার যে সময় জন্মগ্রহণ করেন সেই কল্পিত তারিখ থেকে প্রায় এক হাজার বছর পরে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে গ্রীকসাম্রাজ্য কত বড় হয়েছে, কত দিকে কত উন্নতি লাভ করেছে; আবার ফুলের মত ঝরে পড়েছে, তার সমস্ত গৌরব নিয়ে। একদিন যখন সুসময় ছিল, এই সাম্রাজ্য কত বীরের জয়োল্লাসে স্ফীত হ'য়ে উঠেছিল, এবং কত বিখ্যাত সাহিত্যিক তাঁদের অমূল্য রচনা দিয়ে একে সুসজ্জিত করেছিলেন। তারপর যত দিন যেতে লাগল তত তার সৈন্যবল দুর্ব্বল হ'য়ে পডলো এবং বিজিত রাজ্যগুলি একে একে হস্তচ্যুত হ'য়ে গেল। এই ভাবে যদিও একদিন উজ্জ্বল গ্রীক সাম্রাজ্য ম্লান হ'য়ে পড়লো তবুও কিন্তু তার ভাগ্যাকাশে সাহিত্যের জয়গৌরব অম্লান-জ্যোতিতে প্রতিভাত হ'তে লাগল।

রণনিপুণ বলিষ্ঠ রোমান সৈন্যদল এসে যখন পতনোন্মুখ গ্রীক-সাম্রাজ্যের ইমারত ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিলে, তখন যুদ্ধে রোমানদের কাছে গ্রীকরা হারল বটে, কিন্তু সাহিত্যে তারা রইল অজেয় হ'য়ে।

ভার্জ্জিল নিজে এর জ্বলন্ত উদাহরণ! শ্রেষ্ঠ রোমান কবি হ'য়েও তিনি কোনদিন গ্রীক কবিদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারেননি।

অথচ রোম সাম্রাজ্য যখন গৌরবের উচ্চ শিখরে, তখন জন্মগ্রহণ করেন ভার্জ্জিল। ইউরোপের সবচেয়ে সুন্দর স্থানগুলি তখন রোমানদের অধীনে ছিল। বিখ্যাত নদী রাইন ও দানিয়ুবের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল জুড়ে ছিল এই সাম্রাজ্য বিস্তৃত। রোমান সৈন্যগণ এদিকে এশিয়ার মেসোপোটেমিয়া, ওদিকে আফ্রিকার উত্তর অঞ্চল, এমন কি দক্ষিণ সাহারা পর্য্যন্তও অগ্রসর হয়েছিল। রোমানদের বীরত্ব দেখে

তখন সমস্ত পৃথিবী স্তম্ভিত। ভয়ে রোমরাজ্যের কাছে সবাই মাথা নত ক'রে থাকত।

যদিও সেই সময় রোমের যশোগান যে-সব কবিরা গাইতেন তাঁদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ভার্জ্জিল, তবুও তিনি নিজে রোম শহরে জন্মগ্রহণ করেননি বা জাতে খাঁটি রোমান ছিলেন না।

রোম থেকে বহু দূরে ইতালীর উত্তরে 'মানটুয়া' নামে একটি শহর ছিল—তারই নিকটবর্ত্তী কোনস্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য ভার্জ্জিল বড হ'য়ে ওঠবার অনেক পরে সেই স্থানটিকে রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেওয়া হয়েছিল।

ভার্জ্জিলের বাপ ছিলেন একজন জোতদার। চাষ-আবাদের ওপর তাঁর সংসার নির্ভর করতো। কিন্তু তবুও বহু কষ্ট সহ্য ক'রে তিনি ছেলেকে উচ্চ শিক্ষা দেন।

বালক ভার্জ্জিল প্রথমে ইতালীর উত্তরে দু'টি প্রাচীন শহর—ক্রীমোনো ও মিলানে লেখাপড়া শেখেন। তারপর যুবক হ'য়ে তিনি যান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র রোমে।

সেই সময় রোমে চিরস্মরণীয় ঘটনাবলীর অভিনয় চলছিল। জুলিয়াস্ সীজার এবং তাঁর বন্ধু ও শত্রুদের মধ্যে যে দারুণ সঙ্ঘর্ষ ঘটে তা সমস্ত পৃথিবীকে কম্পিত ক'রে তুলেছিল। আর তারই ফলস্বরূপ খৃষ্ট জন্মবার চুয়াল্লিশ বছর পূর্ব্বে সীজারের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং তারপরেই দেখা দেয় সমাজের মধ্যে নানারকমের অশান্তি ও যুদ্ধবিগ্রহ। তখন ভার্জ্জিলের বয়স ছাব্বিশ বৎসর।

এই সময় ভয়ে তিনি নিজের দেশ মানটুয়াতে ফিরে গেলেন। কিন্তু তাতেও তাঁর অশান্তি কিছুমাত্র কমলো না। তাঁর পিতার কাছ থেকে সমস্ত জমিজমা কেড়ে নিয়ে বিদ্রোহীরা তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ভার্জ্জিল তখন রোমের কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী বন্ধুর সাহায্যে তাঁর

বৃদ্ধ পিতাকে সেই চরম দুর্দ্দশা থেকে রক্ষা করলেন। বৃদ্ধ পিতা এর জন্য পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করলেন।

এই সমস্ত গোলমাল ও হাঙ্গামার পর কিছুদিন বেশ শান্তিতে কাটল। ভার্জ্জিল আবার রোমে ফিরে গেলেন, কবিতা লিখলেন এবং সেখানে বহু বিখ্যাত লোকের সঙ্গে এই সূত্রে তাঁর আলাপ হ'লো। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন কবি হোরেস্। তিনি অনেক ছোট ছোট গীতিকাব্য লিখেছিলেন এবং ভার্জ্জিলের পরেই রোমান কবিদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

তারপর ক্রমশঃ ভার্জ্জিলের কবি-খ্যাতি সম্রাট্ 'অগাষ্টাসে'র কানে গিয়ে পৌঁছল। তিনি হ'লেন জুলিয়াস্ সীজারের ভাইপো। খুড়োর মৃত্যুর কয়েক বছর পরেই নিজ বাহুবলে অধিকাংশ রোম সাম্রাজ্য জয় ক'রে তার একচ্ছত্র অধিপতি হয়েছিলেন।

অগাষ্টাসের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ভার্জ্জিলের জীবনে একটা স্মরণীয় ঘটনা। খৃষ্ট জন্মাবার ঊনত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন তিনি ভার্জ্জিলকে ডেকে পাঠালেন, তাঁকে কবিতা শোনাবার জন্য। ভার্জ্জিল তাঁর প্রথম বয়সের লিখিত শ্রেষ্ঠ রচনাটি অগাষ্টাসের সম্মুখে পাঠ করলেন। কবিতাটির নাম Georgies—পল্লীজীবনের কয়েকটি সুন্দর বর্ণনা ছিল তার মধ্যে।

কবিতা শুনে অগাষ্টাস অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন এবং তার উচ্চ প্রশংসা ক'রে ভার্জ্জিলকে অনুরোধ করলেন এমন বীরত্বপূর্ণ কবিতা লিখতে যা শুনে রোমানদের শিরায় উপশিরায় রক্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠবে এবং বক্ষ স্ফীত হবে বিজয়গর্ব্বে। বিশেষ করে তিনি রোমের শৌর্য্যবীর্য্য ও কীর্ত্তিকাহিনী নিয়ে কবিতা রচনা করতে ভার্জ্জিলকে বললেন।

সম্রাটের মুখ থেকে প্রশংসা শুনে ভার্জ্জিল উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন এবং রোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ওপর ভিত্তি ক'রে এক দীর্ঘ বীরত্বপূর্ণ কাব্য লিখতে শুরু করলেন। এই কাব্যটির নামই 'ইনিড'। এত

সুন্দর রচনা এই কবিতাটি যে একে বিশ্বসাহিত্যের অলঙ্কার বিশেষ বলা হয়। কারুর কারুর মতে হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসির পরবর্ত্তী স্থান আজও এই ইনিড কাব্য অধিকার ক'রে আছে।

যদিও ইনিডের ঘটনা ও তার পরিণতি হোমারের বীরত্বপূর্ণ কাব্য ওডিসিকে অবলম্বন ক'রেই লেখা এবং অনেক স্থলে তার সঙ্গে মিল আছে তবুও লিপিচাতুর্য্যের গুণে সে এমন অপূর্ব্ব হ'য়ে উঠেছে যে লোকে সে কথা ভুলেই যায়।

ভার্জ্জিলের এই কবিতার নায়ক হলেন "ইনিয়াস"। তিনি ছিলেন ট্রয়ের একজন যোদ্ধা। হোমার তাঁকে বর্ণনা করেছেন ট্রয়ের নায়ক হেক্‌টরের পরবর্ত্তী বীর ব'লে। ট্রয়ের পতনের পর ইনিয়াস তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে পিঠে নিয়ে ও বালকপুত্র 'এসকানিয়াস'-এর হাত ধরে সমুদ্র তীরে গিয়ে লুকিয়ে থাকেন। তারপর 'ওডিসিউসে'র মত যাত্রা করেন এক দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল সমুদ্রপথে।

বহুদেশ অতিক্রম ক'রে চললো তাঁর নৌকা। পথে হঠাৎ একটা ঝড়ের মধ্যে পড়ে আবার নৌকা গিয়ে আটকাল আফ্রিকার উপকূলের একস্থানে।

কার্থেজের রাণী ডিডো সেখানে থাকতেন। ইনিয়াসকে তিনি সেখানে বাস করতে বললেন। কিন্তু ইনিয়াস রাণীর এই প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়ে আবার নৌকা নিয়ে অজ্ঞাত পথে যাত্রা করলেন।

এতে ডিডোর মনে বড় আঘাত লাগল। তিনি এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে শেষে একদিন আত্মহত্যা করলেন।

তারপর ঘুরতে ঘুরতে ইনিয়াস সাত বৎসর পরে ইতালীতে গিয়ে পৌঁছলেন। টাইবার নদীর মুখে ল্যাটিয়াম দেশের রাজা ল্যাটিনাস এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন এবং রাজপুরীতে নিয়ে গিয়ে তাঁর কন্যা ল্যাভিনিয়ার সঙ্গে বিবাহ দিলেন।

ইনিয়াস্ ল্যাভিনিয়াকে বিয়ে করাতে টারন্যাস নামে একটি লোক ভয়ানক চটে গেল। সে ল্যাভিনিয়াকে বিয়ে করবে ব'লে আগেই ল্যাটিনাসের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিল। তাই আশা ভঙ্গ হওয়াতে টারন্যাস, ইনিয়াস ও ল্যাটিনাসকে একত্রে আক্রমণ করলে কিন্তু নিজেই যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে নিহত হ'লো।

টারন্যাসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ইনিড্ কবিতাটি শেষ হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা বলেন, বিশেষ ক'রে সকলের চেয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক লাইভি বলেন, ইনিয়াসের নামের উল্লেখ রোমানদের পুরাণে আছে—রোম সাম্রাজ্যের নাকি তিনিই প্রতিষ্ঠাতা।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এই কবিতাটির সঙ্গে ভার্জিলের মৃত্যুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

খৃষ্ট জন্মাবার উনিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি এই কাব্যটির রচনা শেষ করেন। কিন্তু তখনো তিনি সন্তুষ্ট হননি। তাই স্থির করলেন গ্রীসে গিয়ে কয়েক বছর থাকবেন এবং কাব্যটিকে সেইখানে আরো ভাল ক'রে রূপ দেবেন।

এদিকে গ্রীসে যাবার পর সেখানে অগাষ্টাসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'লো। তিনি তখন ভার্জ্জিলকে তাঁর সঙ্গে ইতালীতে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন।

এই বাড়ী ফেরবার সময়ই পথে অত্যধিক সূর্য্যের তাপ লেগে তিনি অসুস্থ হ'য়ে পড়েন এবং দেখতে দেখতে ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হন। কিন্তু এই অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি ক্ষান্ত হননি, বিশ্রাম নেবার জন্য তিনি অগ্রসর হ'তে লাগলেন বাড়ীর দিকে।

কিন্তু এইভাবে কয়েকদিন চলবার পরে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হ'য়ে 'ব্রাণ্ডিসিয়ামে' এসে পৌঁছলেন এবং সেইখানেই তাঁর মৃত্যু হ'লো।

নেপল্‌সে নিয়ে গিয়ে তাঁর মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়। তারপর

থেকে বহুকাল পর্য্যন্ত লোকে তাঁর এই সমাধিস্থলকে ধর্ম্ম-মন্দিরের মত ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতো।

যুগ যুগ কেটে গেছে কিন্তু এখনো লোকে তাঁর কথা ভোলেনি। তিনি তাঁর পশ্চাতে যে মান ও যশ রেখে গিয়েছেন তা চিরকাল অক্ষয় ও অমর হ'য়ে বিশ্ববাসীর অন্তরে বিরাজ করবে।

রোল্যাণ্ডের সঙ্গীত

অগাষ্টাসের মৃত্যুর পর থেকে রোমসাম্রাজ্য ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তারই মধ্যে এক সময় আবার হঠাৎ তার অসভ্য প্রজারা ক্ষেপে উঠে এমন প্রচণ্ড আঘাত করলে সাম্রাজ্যের মূলে যে শীঘ্রই সমস্ত সাম্রাজ্য ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেল।

এইভাবে ৪১২ খৃষ্টাব্দে সমগ্র রোমসাম্রাজ্য লুণ্ঠিত হ'লো এবং অধিকৃত হ'লো। ফলে একদিন যে দেশগুলি ছিল রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, যথা,—গ্যল (অর্থাৎ ফ্রান্স), স্পেন ও বৃটেন, তারা আবার স্বাধীন দেশে পরিণত হ'লো। তারপর মধ্যযুগে আবার একসময় কেউ কেউ সেই খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন দেশগুলিকে একত্রিত ক'রে রোম-সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিলেন স্বাধীনরাজা শারলিমেন। খৃষ্টের মৃত্যুর আটশত বৎসর পরে এক 'বড়দিনে' পোপ লিয়ো তাঁকে প্রতীচ্যের সম্রাটরূপে বরণ করেন।

শারলিমেনের পবিত্র রোমসাম্রাজ্য নামে যা একদিন সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিল, তা কিন্তু আর তাঁর মৃত্যুর পর বর্ত্তমান রইল না—ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'লো। তাঁর নামকে অবলম্বন ক'রে বহু বীরত্বের কাহিনী মধ্যযুগে প্রচলিত হয়েছিল। চারণরা বংশপরম্পরায় সেইসব

কাহিনী আবৃত্তি ক'রে শোনাত, যখন যেখানে সম্ভ্রান্ত নরনারীর সমাবেশ হ'তো। এই সমস্ত চমকপ্রদ কাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যেটি, তা প্রাচীন ফরাসীভাষায় রচিত। তার নাম হ'লো 'Chanson de Roland' অথবা রোল্যাণ্ডের সঙ্গীত।

শারলিমেনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা রোল্যাণ্ড ও তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু অলিভারের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে এই গানটি রচিত। অবশ্য এই দু'টি বীরের সঙ্গে আরো দশজন অতি বিখ্যাত বীরের কাহিনীও আছে এতে। এই বারোজন বীর ওমরাহ, একবার শারলিমেনের ক্রীশ্চান বাহিনী নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন সারাসেনের পৌত্তলিক সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে।

৭৭৪ খৃষ্টাব্দে শারলিমেন তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে স্পেন আক্রমণ করেন। সাত বৎসর ধরে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন সারাসেনদের সঙ্গে। তারা আফ্রিকা অতিক্রম ক'রে সেখানে এসে জমি দখল ক'রে বসেছিল। অতিকষ্টে শেষে ক্রীশ্চানদের হ'য়ে সমস্ত স্পেন তাঁরা পুনরুদ্ধার করলেন, শুধু নিতে পারলেন না সারাগোসা—সারাসেনদের রাজা মারসাইলের রাজধানী ছিল সেখানে।

তখন সারাসেনরাজ দূতমুখে ব'লে পাঠালেন যে, তিনি শারলিমেনের আনুগত্য স্বীকার করতে রাজী আছেন, যদি শারলিমেন এখনি তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে স্পেন পরিত্যাগ করেন।

শারলিমেনের বীর ওমরাহ্‌গণ তাতে রাজী হলেন না। তাঁরা যুদ্ধ করবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু জেনিলোন সন্ধি করবার জন্য তাঁদের পরামর্শ দিলেন। জেনিলোন হলেন দুর্দ্ধর্ষ বীর এবং রোল্যাণ্ডের পালক-পিতা।

তখন জেনিলোনকে দূতরূপে মারসাইলের কাছে পাঠানো হ'লো। কিন্তু জেনিলোন সেখানে গিয়ে মারসাইলের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র

আঁটলেন রোল্যাণ্ড ও তাঁর বন্ধুদের হত্যা করবার জন্য। আর মারসাইল এই কাজের জন্য দশটি গাধা-বোঝাই সোনা আগেই তাকে ঘুষ দিলেন।

সন্ধি হ'য়ে গিয়েছে মনে ক'রে শারলিমেন তখন সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে যেতে আদেশ দিলেন। উত্তর দিকের পেরিনিসের পর্ব্বতময় ও বিপদসঙ্কুল গিরিবর্ত্ম দিয়ে তারা অগ্রসর হ'লো। আর তাদের সাবধানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার পড়লো রোল্যাণ্ড ও তাঁর বন্ধুদের ওপর।

কিন্তু রন্‌সিভ্‌কৃস্‌-এর নিকট পেরিনিয়ান পর্ব্বতের একটি দুর্গম উপত্যকা ছিল—সেখানে রোল্যাণ্ডরা উপস্থিত হ'তেই জেনিলোনের চক্রান্ত কার্যকরী হ'লো। অলিভার একটু উঁচু পাহাড়ের ওপর উঠে প্রথম লক্ষ্য করলেন, প্রায় চার লক্ষ সারাসেন সৈন্য সেইদিকে আসছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ক্রিশ্চিয়ান সৈন্য নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপর ভীষণভাবে যুদ্ধ চলতে লাগল।

দলের পর দল পৌত্তলিক সৈন্যরা আসতে লাগল এবং দলের পর দল তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'তে লাগল। রোল্যাণ্ডের সৈন্যরাও সব নিহত হ'লো এই ভীষণ যুদ্ধে। কিন্তু যখন আর মাত্র সাটজন সৈন্য অবশিষ্ট আছে সেই সময় রোল্যাণ্ড তাঁর সিঙ্গাতে ফুঁ দিলেন। পাহাড়ের মধ্যে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হ'তে হ'তে সেই শব্দ দূর দূরান্তে মিলিয়ে গেল।

সেই বিপদের সঙ্কেতধ্বনি তখন শারলিমেনের কানে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর মূল সৈন্যবাহিনী নিয়ে রোল্যাণ্ডকে সাহায্য করবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটে এলেন, কিন্তু এসে দেখলেন রোল্যাণ্ড তখনো একাকী ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে শত্রুবাহিনীর মধ্যে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছেন।

শারলিমেন ও তাঁর সৈন্যদলের মিলিত চীৎকারধ্বনি শুনতে পেয়ে মুমূর্ষু রোল্যাণ্ডের বক্ষ আবার স্ফীত হ'য়ে উঠলো। তিনি দেখলেন সারাসেনরাও তাঁদের আগমনবার্তা পেয়ে প্রাণভয়ে ছুটছে দিগবিদিক্

জ্ঞানশূন্য হ'য়ে। রোল্যাণ্ড প্রাণপণে তখন আর একবার সিঙ্গাতে ফুঁ দিলেন। এই তাঁর শেষ সিঙ্গা বাজলো। তারপর সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি প্রাণত্যাগ করলেন।

এই হ'লো 'সঙ্ অফ্ রোল্যাণ্ডে'র মূল আখ্যানভাগ। এ কাহিনীটি এমন উত্তেজিত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে যে, রণভেরীর মত এর ছন্দে দেহের সমস্ত রক্ত চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। এ ছাড়া আরো অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী তাতে আছে—কোনটি শারলিমেনের সম্বন্ধে, কোনটি বা কিং আর্থার ও তাঁর রাউণ্ডটেবিল নাইটের সম্বন্ধে—তা ছাড়াও কেবল জনসাধারণের জন্য সাধারণ ঘটনাবলীও অনেক আছে এতে। মোটকথা এই সমস্তগুলি মিলিয়ে এ অতি মনোরম ও সুখপাঠ্য।

আইসল্যাণ্ডের সাহিত্য এডাস্

এইবার আমরা ফ্রান্স, স্পেন ও ইতালীর দ্রাক্ষাকুঞ্জ, শস্যক্ষেত্র, সূর্য্যের আলো ও নদীর ঝলমলানি শোভা ছেড়ে এমন এক জায়গায় যাবো যেখানে গাছপালা নেই, সূর্য্য নেই. আছে শুধু রাশি রাশি বরফ জমাট হ'য়ে—জলে, স্থলে, চারিদিকে। এই স্থানটি একেবারে উত্তরে—একে বলে মেরুপ্রদেশ।

প্রায় ৮৭০ খৃষ্টাব্দে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার এক বীর একটি সুন্দরী মেয়েকে বিবাহ করবার জন্য একেবারে ক্ষেপে উঠলেন। এই বীরটির নাম হ্যারল্ড এবং মেয়েটির নাম গ্রীডা। কিন্তু গ্রীড়া তাতে সম্মত হলেন না। তিনি বললেন, আমি বিয়ে করতে পারি, যদি তুমি সমস্ত নরওয়েটা জয় ক'রে আমায় দিতে পারো।

হ্যারল্ডের মাথায় খুব সুন্দর চুল ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ গ্রীডার সামনে প্রতিজ্ঞা করলেন যে. যতদিন না সমগ্র নরওয়ে জয় করতে

পারবেন, ততদিন আর তাঁর মাথার চুল কাটবেন না। বলা বাহুল্য হ্যারল্ড এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন।

সেই সময় নরওয়ে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তিনি একটার পর একটা রাজ্য আক্রমণ করতে লাগলেন এবং একটার পর একটা রাজ্য জয় করে নিতে লাগলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে একজন রাজা ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও স্বাধীন মতাবলম্বী। তিনি হ্যারল্ডের কাছে কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করলেন না। তিনি পালিয়ে গেলেন তাঁর লোকজন নিয়ে সুদূর উত্তরে, তুষারমেরু প্রদেশে এবং সেইখানে গিয়ে আইসল্যাণ্ড দ্বীপে এক নতুন রাজ্য স্থাপন করলেন। তারপর নতুন জায়গায় গিয়ে বহু কষ্টভোগ ক'রে ক্রমশঃ তাঁরা আবার উন্নতিলাভ করলেন। কিন্তু নিজের দেশ থেকে চিরকালের মত নির্ব্বাসিত হ'লেও তাঁরা শৌর্য্যবীর্য্য পূর্ব্ব খ্যাতি অটুট রেখেছিলেন।

আইসল্যাণ্ডে শীতকালে রাত্রি যেমন দীর্ঘকালব্যাপী তেমনই অন্ধকারময়। চন্দ্রকিরণ অথবা আলেয়ার আলো ছাড়া সেখানে মাসের পর মাস শুধু অন্ধকার ঢেকে থাকে। এই সময়টা নির্ব্বাসিত স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াবাসীরা অত্যন্ত কষ্টভোগ করত; তারা না পারত শীকার করতে, না পারত মাছ ধরতে, না পারত সমুদ্রে গিয়ে নৌকা বাইতে। কাজেই সময় কাটাবার জন্য তারা করত কি, আগুন জেলে তার চারি-পাশে গোল হ'য়ে ব'সে নিজেদের দেশ নরওয়ের প্রাচীন গল্প বলত ও শুনত। এ সব গল্পের অধিকাংশই প্রথম আগন্তুকদের স্মৃতিতে বাহিত হ'য়ে সেখানে এসেছিল। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল ততই গল্পগুলি মুখে মুখে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হ'য়ে চললো। এই ভাবে ক্রমশঃ গল্পগুলি দু' ভাগে বিভক্ত হ'য়ে গেল। এর একভাগ হ'লো কবিতা, আর একভাগ হ'লো গদ্য। এদের নাম এডাস্ (Eddas)।

আইসল্যাণ্ডের প্রত্যেক বাসিন্দা এই এডাস জানেন ও আবৃত্তি

করেন। এই এডাস না জানা তাদের দেশে একটা চরম মূর্খতা এবং সর্ব্ববিষয়ে অজ্ঞতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে একজন পাদ্রী সেখানে এর একটি বই আবিষ্কার করেন, তাকে বলা হয় বড় এডা। তাতে কবিতার আকারে প্রাচীন মেরুদেশীয় ভাষায় কতকগুলি গল্প পাতলা চামড়ার মত কয়েকখানি পাতায় লেখা ছিল। সেই ভাষাতেই তখনকার প্রাচীন কবিরা লিখতেন। আর সেই সব তাঁরা চারণ বীরদের মত গেয়ে গেয়ে বেড়াতেন যখন যেখানে সম্ভ্রান্ত নরনারীর সমাবেশ হ'তো।

গদ্য গল্পগুলিকে ছোট এডা বলা হয়, যদিও সেইগুলি প্রায় একহাজার বছর ধরে মেরুপ্রদেশীয় ভাষার গর্ব্বস্বরূপ হ'য়ে আছে। এই আশ্চর্য্য বইগুলি তৈরী করতে, কত কণ্ঠস্বর কত মস্তিষ্ক ও কর্ম্মঠ হস্তের যে একদিন প্রয়োজন হয়েছিল তা কে বলতে পারে!

এই এডাসগুলির সব মূল গল্প লিখতে গেলে বহু কাগজ খরচ হবে। তাই সংক্ষেপে তাদের সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই বলা চলে যে, এই বইগুলি থেকে আমরা জানতে পারি মেরুদেশীয় যোদ্ধা ও তাদের বীর দেবতা ও অপদেবতার বহু আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাহিনী। কেমন ক'রে পৃথিবী সৃষ্টি হ'লো, মানে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ানদের সে সম্বন্ধে কি ধারণা, তোমরা শুনলে হয়ত অবাক হ'য়ে যাবে। তাদের বিশ্বাস 'ড্রসিল' নামক প্রকাণ্ড গাছ হ'লো জীবনবৃক্ষ, আর তার শিকড় বরাবর নরকে চলে গেছে,—একটি সাপ তার গোড়ায় গর্জ্জন করে, একটি ঈগল পাখী বাস করে তার ডালে এবং একটি কাঠবিড়ল তার কাণ্ডে ঘুরে বেড়ায় সর্ব্বদা মানুষের অনিষ্ট সাধন করবার জন্য। এ ছাড়া এডাস থেকে জানতে পারা যায় স্বর্গের মহান দেবতা ওডিন ও থোরের গল্প এবং সুন্দর দেবতা বলডারের কথা। তারা নিয়ে যায় আমাদের মনকে অত্যন্ত বিষাদ ও ভয়াবহ হিমশীতল প্রদেশে, কখনো বা অগ্নিময় স্থানে, যেখানে আছে 'ভলহল্লা'

নামে একটি প্রকাণ্ড ঘর, তার পাঁচশো চল্লিশটি দরজা—যুদ্ধে নিহত বীরদের আত্মা নাকি সেখানে বাস কার। তারা সেখানে খায় দায়, যুদ্ধ করে আর ঘুরে বেড়ায়। এদের মধ্যে কতকগুলি গল্প বেশ কৌতুকপূর্ণ আর বাকীগুলি—যেমন হংসকুমারীর গল্প প্রভৃতি—বেশ সুন্দর। তাছাড়া প্রতিহিংসামূলক করুণ গল্পও ঢের আছে।

তাদের মধ্যে একটি গল্পের নাম 'সঙ্ অফ থ্রিম'। বিখ্যাত দেবতা থোর সম্বন্ধে তাতে বলা হয়েছে যে, তাঁর এক হাতে একটি হাতুড়ি ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে একবার নাকি তাঁর সেই হাতুড়িটা হারিয়ে যায় এবং কিছুদিন পরে থোর আবিষ্কার করেন যে সেটা হারায়নি, থ্রিম নামে একটি রাক্ষস চুরি করেছে।

থোর যখন সেটা ফিরিয়ে দেবার জন্য তার কাছে দাবী জানালেন থ্রিম কিন্তু কিছুতেই দিতে রাজী হ'লো না। সে বললে, আমি ফিরিয়ে দিতে পারি যদি তুমি দেবী ফ্রেইয়াকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

তখন থোরের মাথায় একটা মতলব গেল। তিনি করলেন কি, নিজে মেয়েমানুষের পোশাক পরে ফ্রেইয়ার বেশে থ্রিমের কাছে গেলেন। তাঁকে দেখে রাক্ষসটার ভারি আনন্দ হ'লো, কিন্তু সে আনন্দ বেশীক্ষণ রইল না। কারণ থোর তাকে হত্যা ক'রে তার হাতুড়িটা কেড়ে নিয়ে বাড়ী ফিরে গেলেন।

এ রকম আরো অনেক গল্প আছে; এবং তাদের অধিকাংশই করুণ ও ভয়াবহ। কারণ যে সব লোকেরা চিরকাল বরফ, অন্ধকার আর শীতের মধ্যে বাস করে, এ শ্রেণীর গল্প ঠিক তাদেরই উপযুক্ত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই গল্পগুলি এমন মধুর ভাবে লেখা যে, আমরা তাদের মধ্যে যথেষ্ট সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণ অনুভব করি। আর তারই ফলে বোধ হয় আজও এড়াস বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে।

ইতালীর শ্রেষ্ঠ কবি দান্তে

অরানো নদীর ওপর ইতালীর সুন্দর শহর ফ্লোরেন্স। তার চারিদিকে দ্রাক্ষাক্ষেত্র আর কমলালেবুর কুঞ্জ। ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে ইতালীর শ্রেষ্ঠ কবি দান্তে সেখানে জন্মগ্রহণ করেন।

ফ্লোরেন্স শহরটি সুন্দর হ'লেও কিন্তু সেখানকার লোকজনরা মোটেই সুখী ছিল না। ভীষণ অশান্তির মধ্যে তারা বাস করতো, তাদের মধ্যে সদাসর্ব্বদা বিবাদ লেগেই থাকতো। ফ্লোরেন্স তখন ছোট ছোট বহু অংশে বিভক্ত ছিল। এবং তাদের একজন আর একজনের বিরুদ্ধে অনবরত চক্রান্ত করতো, ফলে হত্যা, মারামারি ও যুদ্ধবিগ্রহের অন্ত ছিল না। তাছাড়া যখনই একজন এসে ফ্লোরেন্স অধিকার করতো, আর একজন তখনই এসে তার কাছ থেকে সেটা কেড়ে নিত—কতবার যে এ রকম হয়েছে তার ঠিক নেই। যাক্, সে সব বিস্তৃত বিবরণ এখানে দিয়ে লাভ নেই। তবে এইটুকুমাত্র জানা দরকার যে এই সব বিষয়ে কবি দান্তের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাই আজ আমাদের ভাবতে বিস্ময় লাগে যে, এই স্বপ্ন-বিলাসী গম্ভীর প্রকৃতির কবি কেমন ক'রে এত গভীরভাবে সেই সময়কার কুৎসিত ও নরহত্যাকর ইতালীর রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

আর কেবল যে রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তা নয়, ভবিষ্যতে তিনি একদিন ফ্লোরেন্টাইন পার্টি, যাকে ইতালীয় ভাষায় 'বিয়ানশে' অথবা 'শ্বেতদল' বলা হ'তো, তার নায়ক মনোনীত হন। তাঁর বিপক্ষ দল বা শত্রুদলকে বলা হ'তো 'নেরী' অথবা 'কৃষ্ণবর্ণ দল'। কিন্তু রাজনীতি নিয়ে উঠে পড়ে লাগলেও দান্তে সম্পূর্ণভাবে তাতে মনোনিবেশ করতে পারেননি। সেই সময় তিনি বহু সুন্দর কবিতা রচনা করেছিলেন এবং হোমার, ভার্জিল, হোরেস প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত কবিদের

রচনা নিয়মিত পাঠ করতেন। তাছাড়া বিয়েত্রিচে নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তখন তাঁর এমন গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল যে, যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন তাঁকে কখনো ভুলতে পারেননি।

এই বিয়েত্রিচে ফ্লোরেন্সের এক ওমরাহের মেয়ে। একদিন তাঁদের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে দান্তে তাঁকে দেখলেন। তারপর ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল তাঁদের আলাপ পরিচয়। যদিও দান্তে খুব কম তাঁদের বাড়ী যেতেন এবং মোটে বেশী কথা বলতেন না বিয়েত্রিচের সঙ্গে, তবুও তাঁর এই না-বলা-কথার মধ্যে এমন গভীর বাণী লুকানো ছিল যে সারা জীবন ধরে তিনি তা কাউকে বলেননি, নিজের অন্তরে গোপন রেখেছিলেন। এমনকি বিয়েত্রিচে পর্যন্ত তা জানতে পারেননি।

কেন তিনি সে কথা বিয়েত্রিচেকে বলেননি তাও বলা বড় শক্ত। তবে তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, বিয়েত্রিচেকে নিয়ে এমন কবিতা রচনা করবেন, যা পৃথিবীতে আর কোন কবি কোনদিন কল্পনা করতে পারবেন না। আর কেমন ক'রে একদিন তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল, পরে বলছি।

দান্তের এই না-বলা-কথার মধ্যে যাই থাক্ বিয়েত্রিচে তা কোনদিনই বুঝতে পারেননি, তাই যথাসময়ে অপর একটি ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হ'য়ে গেল। কিন্তু বিয়ের অল্প কিছুদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিয়েত্রিচের এই মৃত্যুকে দান্তে তাঁর কবিতায় রূপ দিয়েছেন 'স্বর্গীয় সুখের মধ্যে সে চলে গেল' এই ব'লে।

তারপর দান্তে নিজে বিয়ে করলেন এবং সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার করতে লাগলেন। কিন্তু কখনো তাঁর মন থেকে বিয়েত্রিচের সেই চিরমধুর মূর্তিটি মুছে যায়নি।

এদিকে যতদিন যেতে লাগল দান্তেও তত তাঁর রাজনৈতিক শত্রুদের সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করতে লাগলেন। কিন্তু এক সময়ে

হঠাৎ এই শত্রুরা এমন প্রবল হ'য়ে উঠলো যে, তিনি তাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

১৩০০ খৃষ্টাব্দে কোন জরুরী কার্য্যোপলক্ষে একবার তিনি রোমে গিয়েছিলেন পোপের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু তাঁর এই অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ঠিক সেই সময় তাঁর শত্রুরা এসে ফ্লোরেন্স অধিকার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ও তাঁর বন্ধুদের চিরজীবনের মত নির্ব্বাসন দণ্ডের আদেশ দেয়। এই দণ্ডাদেশ তখন তাঁর কাছে মৃত্যুদণ্ডের চেয়েও বেশী মনে হয়েছিল। কারণ ফ্লোরেন্স ছিল তাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। যেখানে তাঁর হাসি অশ্রু, দুঃখ, আশা নিরাশা জড়িয়ে আছে, সেইস্থান চিরকালের জন্য ত্যাগ করতে হবে ভেবে তাঁর অন্তর কেঁদে উঠলো।

নির্ব্বাসিত হ'য়ে কুড়ি বছর ধরে দান্তে শুধু ইতালীর সীমাবদ্ধ জায়গার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কখনো কখনো তিনি প্যারীর কাছাকাছি কোন এক স্থানে গিয়ে নাকি অত্যন্ত অশান্তি ও উদ্বেগ নিয়ে মাস কয়েক ধরে বাস করতেন। এমনকি এ সম্বন্ধে একটা গল্পও প্রচলিত আছে। এই নির্ব্বাসন তাঁর কাছে এত অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল যে, দান্তে নাকি একবার সুদূর ইংল্যাণ্ড পর্য্যন্ত ছুটে গিয়েছিলেন মনোকষ্টে! তবে, যেখানেই তিনি যান, এবং যা কিছু মুখে বলুন না কেন, তাঁর অন্তর যে সর্ব্বদা পড়ে থাকতো ফ্লোরেন্সে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

তিনি লিখেছেন যে এই সময় তিনি প্রায়ই স্বপ্ন দেখতে দেখতে চলে যেতেন তাঁর জন্মভূমিতে এবং সেখানে গিয়ে বিয়েত্রিচেকে দেখতে পেতেন। কিন্তু স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবার পরই যখন তিনি আবার বাস্তব জগতে ফিরে আসতেন তখনই বেদনায় তাঁর দু'চোখ জলে ভরে উঠতো। আবার মাঝে মাঝে আশার ক্ষীণ রশ্মি দেখতে পেয়ে তাঁর মন নেচে উঠতো আনন্দে। তিনি ভাবতেন হয়তো তাঁর ওপর থেকে

একদিন এই নির্ব্বাসন দণ্ড তুলে নেওয়া হবে, হয়তো দেশের লোকেরা তাদের কবিকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে! কিন্তু হায়, তাঁর সে আশা কোনদিন মেটেনি।

অবশ্য একবার ১৩১৫ খৃষ্টাব্দে দান্তেকে বলা হয় যে তিনি দেশে ফিরে যেতে পারেন যদি তিনি যে অপরাধ করেছেন তার জন্য প্রচুর টাকা জরিমানা দেন এবং রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে ইতরের মত বেশে সেণ্ট জন চার্চ্চে গিয়ে সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর সে অপরাধ তিনি স্বীকার করেন।

দান্তে হয়তো জরিমানাটা দিতে পারতেন কিন্তু সর্ব্বসাধারণের কাছে অপমানিত হওয়ার কথা চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মন বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। তিনি অস্বীকার করেন সে প্রস্তাব। তারপর থেকে তিনি জীবনে আর কোনদিন ফ্লোরেন্সের মুখ দেখেননি।

১৩২১ সালে যখন তিনি র‍্যাভেনার কাছে একটি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর জায়গায় বাস করছিলেন, সেই সময় হঠাৎ একবার তাঁর জ্বর হয় এবং তাতেই তিনি মারা যান। ফ্লোরেন্স থেকে বহু দূরে এই র‍্যাভেনাতেই তাঁর মৃতদেহ সমাধি দেওয়া হয়। আশ্চর্য্য, মৃত্যুর পরেও তাঁর এই নির্ব্বাসন শেষ হ'লো না।

কিন্তু নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস! তার শত শত বৎসর কেটে যাবার পর, যখন ইতালী একটা সংযুক্তরাজ্যে পরিণত হ'লো, তখন দান্তের সেই নির্ব্বাসন দণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটলো। ফ্লোরেন্স, র‍্যাভেনা ও অন্য যে সব স্থানে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন সেই সব দেশগুলি এক হ'য়ে গিয়ে এক আখ্যা পেলে—দান্তের দেশ! এই রকম ক'রে বহু বিলম্বে এবং বহু ঘটনা ঘটবার পর তবে একদিন ইতালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি তাঁর নিজের দেশে ফিরে গিয়েছিলেন।

দান্তের চরিত্র ছিল অদ্ভুত। সেখানে ভালবাসা ছিল যেমন গভীর

আবার ঘৃণা ছিল তেমন তীব্র! অন্য লোকেরা যা অনুভব করতো ক্ষীণ ও অবসন্নভাবে, তিনি তা অনুভব করতেন প্রচণ্ড তেজস্বিতার সঙ্গে। তাঁর এই অনুভূতির পরিচয় আমরা পাই মধ্যযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক তাঁর 'ডিভাইন্ কমেডি'তে।

আজকাল আমরা 'কমেডি' বলতে বুঝি হাল্কা, হাসিঠাট্টার বই, যা পড়ে হঠাৎ মনটা বেশ খুশী হ'য়ে ওঠে। কিন্তু দান্তের এই তেজোদৃপ্ত মনের সুদূর কোণে কোথাও একফোঁটা হাস্যরস ছিল না। তাঁর এই বইয়ের মধ্যে আছে মধ্যযুগের কল্পনা অনুযায়ী পৃথিবীর বাইরেকার তিনটি বিরাট প্রদেশের চিত্র—নরক, প্রেতলোক ও স্বর্গলোক।

সেই জন্য তাঁর 'ডিভাইন্ কমেডি' তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। 'ইনফারনো' অর্থাৎ নরক। 'পারগেটোরিও' অর্থাৎ প্রেতলোক—মৃত্যুর পর যেখানে আত্মার পাপস্খালন হয়। এবং 'প্যারাডিসো' অর্থাৎ স্বর্গলোক।

দান্তের এই কবিতাটি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং বহু ঘটনার নিখুঁত বর্ণনায় ও বহু মানবচরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘাতপ্রতিঘাতে পরিপূর্ণ। অবশ্য এর মধ্যে যেটা মূলভাব তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

তিনি তাঁর মধুর ইতালীয় ভাষায় গল্পটি এইভাবে বলেছেন—ইংরেজী ১৩০০ সালে একদিন ইষ্টারের আগের বৃহস্পতিবার ভোরবেলা তিনি একটা বাগানের মধ্যে বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ পথে এসে দাঁড়াল তিনটি অতি ভয়ানক জানোয়ার—একটি ভল্লুক, একটি সিংহ ও একটি নেকড়ে বাঘ। তাঁর মনে হ'লো এখনি বুঝি প্রাণ যায়!

এমন সময় অকস্মাৎ তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন বিখ্যাত কবি ভার্জ্জিল। তারপর সেই রোমান কবি তাঁর শিষ্যকে অভিবাদন ক'রে বললেন যে, আমাকে তিনজন দেবী 'ব্লেসেড্ ভার্জ্জিন' 'সেণ্ট লুসি' ও 'বিয়েত্রিচে' আদেশ দিয়েছেন পরবর্ত্তী পৃথিবীর পথ তোমাকে দেখিয়ে

নিয়ে যাবার জন্য।

দান্তে রাজী হলেন।

তখন ভার্জিল দান্তেকে নিয়ে গেলেন প্রথম নরকে। তাঁরা নীচে থেকে আরও নীচে নামতে লাগলেন। এইভাবে নরকের পথ দিয়ে যেতে যেতে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'তে লাগল বহু অভিশপ্ত আত্মার—পোপ, রাজা, কবি, যোদ্ধা প্রভৃতির। তা ছাড়া আরও বহু নিরীহ ব্যক্তিকেও তাঁরা সেখানে দেখতে পেলেন।

তাঁদের অধিকাংশই পৃথিবীতে যে পাপ করেছিলেন মানুষের ওপর অত্যাচার ক'রে, তার প্রায়শ্চিত্ত করছিলেন। তারপর তাঁরা দেখতে পেলেন সকলের নীচে নরকের যে গর্ত্ত তারই তলায় বরফের ওপর চিরাবদ্ধ অবস্থায় শুয়ে আছে শয়তান লুসিফার।

দান্তে ও ভার্জিল তখন সেখান থেকে পৃথিবীর মধ্যে আরো নীচে নেমে গেলেন। তারপর আবার এক দিন ও রাত্রি ধরে উপরে উঠতে উঠতে তাঁরা মাটিতে এসে পৌঁছলেন। সেখান থেকে প্রেতলোকের পাহাড় শুরু হয়েছে এবং এইখানেই সেই সব আত্মারা কিছুকাল বাস করে, যারা তাদের কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হয়, আর প্রায়শ্চিত্তের ফলস্বরূপ নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করে।

তখন সেই কবি দু'জন একে একে সেই পাহাড়ের সাতটি খাড়া শিখরের ওপর উঠলেন। এর মধ্যে যেটি সকলের চেয়ে উঁচু তার মাথার ওপরে আছে পৃথিবীর স্বর্গ। এখানে এসেই ভার্জিল চলে গেলেন। তারপর বিয়েত্রিচে এলো। সে এসে দান্তেকে পথ দেখিয়ে ভগবানের সামনে নিয়ে গেল।

দান্তের অতি বিখ্যাত কাব্যটির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে এই। অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মাথা গুলিয়ে যায় এর অর্থ বুঝতে কারণ এই কাব্যটি হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। দান্তের বন্ধু ও শত্রুদের নিয়ে এতে

এত বেশী ঘটনার উল্লেখ আছে যে, সে সব মনে রাখা অত্যন্ত কষ্টকর। এ ছাড়াও এর সঙ্গে কবির ধর্ম্মভাবাপন্ন বহু কল্পনা অত্যন্ত জটিলভাবে মিশে আছে। সকলে হয়তো এই অংশটি সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু কবির কল্পনাশক্তির অদ্ভুত স্ফুরণ ও বর্ণনার জীবন্ত অভিব্যক্তি দেখে বেশ সহজেই বোঝা যায় যে, দান্তের অন্যান্য বইয়ের মধ্যে এই বইটি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

আরব্য উপন্যাস

'Arabian Nights' বা 'একাধিক সহস্র রজনীর গল্প' যে কবে প্রথম লেখা হয়েছিল তার তারিখ কেউ সঠিক বলতে পারে না, কারণ এই গল্পগুলির মধ্যে যে সব পাত্রপাত্রীর উল্লেখ আছে, তাদের কেউ জন্মেছিলেন খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে, কেউ দশমে, কেউ বা আরো পরে।

তাই বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন যে এই বইটিও একজনের লেখা নয়, বিভিন্ন লোকের লেখা এবং কোন একজন ব্যক্তি সেগুলি সংগ্রহ করেছেন।

এই গল্পগুলি সর্ব্বপ্রথম একত্রে কিতাব্ অলফ্ লায়লা ওয়ালায়লা নামে আরবী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু কবে হয়েছিল তা নিয়েও নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন খৃষ্টীয় তের শতকে, কেউ বা বলেন পনেরোয়। তবে তারিখ নিয়ে গোলমাল থাকলেও এ সম্বন্ধে সবাই এক মত যে, এই গল্পগুলি বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ এবং এর ঐশ্বর্য্য প্রতি জাতির, প্রতি মানবের গর্ব্বের বস্তু। সকল দেশের বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ এর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ও রসপানে বিভোর! বিশ্বসাহিত্যে এ অমৃতস্বরূপ! তাই পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাতেই এর অনুবাদ হয়েছে।

নেহাতই গল্প। শুধু কল্পনায়, বর্ণনায়, ভাষায়, ভঙ্গিমায় এমন সরস ক'রে এমন মধুর ক'রে আজ পর্য্যন্ত আর কেউ কোন গল্প বোধ হয়

বলতে পারেনি। পৃথিবীতে যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে, যতদিন তার শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ থাকবে, ততদিন বোধ হয় এই আরব্য উপন্যাসের গল্পগুলি সে শুনতে চাইবে—ততদিন শহর্‌-আজাদ্‌-এর নাম লোকে ভুলতে পারবে না।

শহর্‌-আজাদ্‌, পারস্যের শাহ্‌ শাহরিয়ারের উজীর-কন্যা। এই গল্পগুলি তিনি শাহ্‌কে রাতের পর রাত জেগে বলেছিলেন আর শাহ্‌ও রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে সেগুলি তাঁর মুখ থেকে শুনেছিলেন। এই ভাবে এক হাজার এক রাত্রি লেগেছিল এই গল্পগুলি বলতে। কেন, তা শুনলে তোমরা বিস্মিত হ'য়ে যাবে।

কোন কারণ বশতঃ একবার এই শাহ্‌ খেয়াল ধরেন যে প্রতিদিন একজন ক'রে মেয়েকে রাত্রে তিনি বিয়ে করবেন, আবার সকালে তাকে মেরে ফেলবেন। ফলে যত দিন যেতে লাগল ততই লোকের ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠতে লাগল। অথচ কেমন ক'রে যে এর হাত থেকে লোকে নিস্তার পাবে, তা ভেবেই পেল না। তখন উজীর-কন্যা শহর্‌-আজাদ্‌ মনে মনে এক মতলব আঁটলেন এবং বাপের কথা না শুনে স্বেচ্ছায় বাদশাহকে বিয়ে করতে রাজী হলেন।

এদিকে বাদশা রাত্রে ঘরে ঢুকেই দেখলেন উজীর-কন্যা সেখানে বসে বসে কাঁদছেন।

তিনি একটু বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কাঁদছো কেন?

শহর্‌-আজাদ্‌ বললেন, আমার ছোট বোনের জন্য মন বড় কেমন করছে। কাল সকালে তো মারা যাবো, তাই একবার তাকে শেষ দেখা দেখতে ইচ্ছে করছে।

বাদশা হেসে বললেন, এর জন্যে এত দুশ্চিন্তা! আচ্ছা, আমি এখনি তাকে আনিয়ে দিচ্ছি।

উজীরের ছোট মেয়েটির নাম দিন্‌-আজাদ্‌। দিদির কাছে এসে

তিনিও কাঁদতে লাগলেন।

বাদশা তখন তাকে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, একি, তুমিও আবার কাঁদতে শুরু করলে কেন?

দিন্-আজাদ্ বললেন, কাল সকাল থেকে তো আর দিদিকে দেখতে পাবো না, তাই দিদির মুখ থেকে যদি শেষ একটা গল্প শোনবার অনুমতি আমায় দেন! দিদির মত গল্প কেউ বলতে পারে না।

বাদশা ভাবলেন, এ তো সামান্য ব্যাপার। একটা গল্প বলতে আর কতটুকু সময় লাগবে, তাই তিনি তাঁর সে প্রার্থনা পূর্ণ করবার অনুমতি দিলেন।

তখন শহর-আজাদ্ দিন্-আজাদ্কে গল্প বলতে আরম্ভ করলেন—আর বাদশাও সেখানে বসে তাই শুনতে লাগলেন। এদিকে হ'লে কি, গল্প শেষ হবার আগেই সকাল হ'য়ে গেল। তখন বাদশা বললেন, আচ্ছা, আজ আর তোমার প্রাণদণ্ড হবে না, রাত্রে গল্পের শেষটা শুনে নিই, তারপর কাল হবে প্রাণদণ্ড।

আবার রাত্রে শহর্-আজাদ্ গল্প বলতে শুরু করলেন কিন্তু সেদিনও শেষ হবার আগেই সকাল হ'য়ে গেল। পরদিনও বাদশা ওই কথাই বললেন। এইভাবে একহাজার এক রাত্রি লেগেছিল সব গল্প বলতে, আর বাদশাও তাই বসে বসে শুনেছিলেন। বলা বাহুল্য, তারপরে আর উজীর-কন্যার প্রাণদণ্ড হয়নি। বাদশাই তাঁকে তাঁর বেগম ক'রে রাখলেন।

এইভাবে শুধু গল্প ব'লে শহর্-আজাদ্ তাঁর নিজের প্রাণ তো রক্ষা করলেনই, তাছাড়া রাজ্যের আরো হাজার হাজার মেয়েকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালেন।

এই অদ্ভুত কাহিনীগুলির মধ্য থেকে একটি গল্প এখন অতি সংক্ষেপে তোমাদের বলবো।

চীন দেশের এক ওস্তাগরের ছেলে হ'লো আলাদীন। বাপ মরে যাবার পর সে পৈতৃক ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে নিষ্কর্মাব মত বাড়ীতে বসে থাকত, আর ইয়ার বন্ধুদের জুটিয়ে দিন-রাত আড্ডা দিত। এদিকে তার বুড়ো মা কোন রকম ক'রে লোকের বাড়ী গতর খাটিয়ে ছেলের ও নিজের পেটের ভাত যোগাত।

একদিন আলাদীন একাকী একটা বনের ধারে বসেছিল, এমন সময় একটা বুড়ো জাদুগর সেখানে এসে তাকে বললে, খোকা আমি তোমার খুড়ো হই।

খুড়ো! আলাদীন তো অবাক। যতদূর তার মনে পড়ে তিন-কুলে তাব কেউ ছিল না।

জাদুগর তখন করলে কি, তার মনের এই সংশয় দূর করবার জন্মে পকেট থেকে গোটাকতক মোহর বার ক'রে তার হাতে দিল। আর যায় কোথায়, মোহর হাতে পেয়ে আলাদীন মনে করলে নিশ্চয়ই সে তার খুড়ো হবে, তা না হ'লে এতগুলো দামী মোহর কখনো পর হ'লে কেউ কাউকে দিতে পারে?

খুড়োকে নিয়ে তখন উল্লাস করতে করতে সে তার মার কাছে গেল। তার মাও সেই জাদুগরকে কখনো দেখেনি তবু এতগুলো মোহর পেয়ে মনে করলে হয়তো কেউ আপনার লোকই হবে! সুতরাং তখন তাকে বাড়ীতে রেখে খুব আদর যত্ন করতে লাগল। জাদুগর তোফা আনন্দে সেখানে রইল।

এমন সময় একদিন জাদুগর চুপি চুপি আলাদীনকে এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটা সুড়ঙ্গ দেখিয়ে বললে, এর ভিতর একটা গোপন স্থান আছে, সেখানে গাছে গাছে হীরে মুক্তো ফলে আছে আর একটা ঘরের মধ্যে একটা পিদিম জ্বলছে। যদি সেই পিদিমটা আমায় এখনি এনে দাও তো তোমায় আরো অনেক হীরে

মুক্তো বকশিশ দেবো।

প্রথমটা আলাদীনের মনে একটু ভয় হয়েছিল, কিন্তু হীরে মুক্তো গাছে ফলে আছে শুনে সে আর লোভ সামলাতে পারলে না, তৎক্ষণাৎ রাজী হ'য়ে গেল।

তখন জাদুগর একটা আংটি তার হাতে দিলে এবং কতকগুলো শুকনো পাতা জ্বেলে বিড় বিড় ক'রে কি মন্ত্র পড়লে। সঙ্গে সঙ্গে সেই সুড়ঙ্গটা বড় হ'য়ে গেল আর তার মধ্যে একটা সিঁড়ি দেখা গেল। আলাদীন তাড়াতাড়ি সেই সিঁড়ি দিয়ে ভিতরে নেমে গেল এবং আগে যত পারলে হীরে মুক্তো নিয়ে জামার পকেট ভর্ত্তি করলে, তারপর সেই ঘরের মধ্যে থেকে পিদিমটা নিয়ে ওপরে উঠে আসতে লাগল। কিন্তু সুড়ঙ্গের মুখের কাছে আসতেই জাদুগর আগে সেই পিদিমটা চাইলে আলাদীনের কাছে।

আলাদীন বললে, ওপরে উঠে দেব।

তার খুড়ো বললে, না, তা হবে না, আগে দিতে হবে তবে তোমায় ওপরে উঠতে দেব।

আলাদীনেরও মনে কেমন একটা জেদ চাপল. সে কিছুতেই সেটা আগে দিতে রাজী হ'লো না। তখন জাদুগর কি একটা মন্ত্র পড়ে সেই গর্ত্তের মুখটা বন্ধ ক'রে দিলে, তারপর সেই দেশ ছেড়ে কোথায় যে চলে গেল তা কেউ জানতেও পারলে না।

তখন আলাদীন একলা সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে বসে কাঁদতে লাগল। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবার মন্ত্র সে জানত না। তাই সুড়ঙ্গের মুখটা প্রথমে সে পিঠ দিয়ে অনেক ঠেলাঠেলি করলে, কিন্তু তাতে কিছুই হ'লো না। শেষে হাত দিয়ে সে তার মাটি খুঁড়তে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণ এইভাবে খোঁড়বার পর হঠাৎ তার আংটিটা একবার মাটির সঙ্গে ঘষে গেল। আর যে-ই ঘষে যাওয়া অমনি বিরাট গর্জ্জন ক'রে

এক দৈত্য সেখানে এসে হাজির হ'লো। তাকে দেখে আলাদীনের মুখ একেবারে শুকিয়ে গেল। তবু সে ভয়ে ভয়ে বললে, তুমি কে?

দৈত্য বললে, আমি আংটির দাস—তুমি যা হুকুম করবে আমি এখনি তাই করতে বাধ্য।

আলাদীনের যেন ধরে প্রাণ ফিরে এল।

সে বললে, আচ্ছা, আমায় আগে এখান থেকে বাড়ী নিয়ে চলো দেখি। মুখের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলাদীন দেখলে সে একেবারে তার বাড়ীতে এসে হাজির। কিন্তু সেখানে পৌঁছে সে আর দৈত্যটাকে দেখতে পেলে না; কোথা দিয়ে এবং কেমন ক'রে কি হ'লো বুঝতে না পেরে, আলাদীনের মাথাটা যেন ঘুলিয়ে গেল, সে তখন সব কথা তার মাকে খুলে বললে।

তার মা তাকে নিষেধ ক'রে দিলে কোথাও একলা যেতে।

এই ভাবে আরও কিছুদিন কেটে যাবার পর আবার তাদের যে দারিদ্র্য, সেই দারিদ্র্য ফিরে এলো। হীরে মুক্তো বিক্রী-করা টাকা যা ছিল সব নিঃশেষ হ'য়ে গেল।

তখন হঠাৎ আলাদীনের মনে পড়লো, সেই পিদিমটার কথা। মিছিমিছি ঘরে পড়ে থেকে লাভ কি—তার চেয়ে বাজারে বিক্রী করলে তবু দু'চারটে পয়সা পাওয়া যাবে। এই মনে ক'রে সে তখন পিদিমটাকে পরিষ্কার করবার জন্য মাজতে বসলো।

এদিকে সে যেমন ঘষেছে সেই পিদিমটা, অমনি আর একটা দৈত্য এসে হাজির হ'লো এবং বললে, আমি পিদিমের দাস, কি কাজ করতে হবে শীগ্‌গির হুকুম করো।

আলাদীন বললে, ভাল ক'রে অনেক দিন খাওয়া হয়নি, আগে আমাদের ভাল ভাল খাবার এনে দাও তো কিছু দেখি। দৈত্যটা তৎক্ষণাৎ রাশি রাশি উৎকৃষ্ট খাবার এনে তার সামনে রাখলে।

তখন আলাদীন ব্যাপারটা বুঝতে পারলে, তাই তারপর থেকে যখন যা দরকার হ'তো একবার সে শুধু পিদিমটা মাটিতে ঘষতো— ব্যস্, অমনি দৈত্য এসে সব এনে দিত।

এইভাবে যখন তাদের সব অভাব ঘুচলো, তখন আলাদীন ক্ষেপে উঠলো সেখানকার রাজকন্যাকে বিয়ে করবার জন্য। একদিন সে তার মাকে প্রচুর হীরে মুক্তোর যৌতুক দিয়ে রাজার কাছে পাঠালে এই প্রস্তাব করতে।

রাজার মেয়ের তখন উজীরের ছেলের সঙ্গে বিয়ের সব ঠিক হ'য়ে গিয়েছিল। তবুও রাজা এই মূল্যবান হীরে-মুক্তোর লোভ সামলাতে না পেরে মিছিমিছি বললেন, আচ্ছা দেখা যাবে পরে।

আলাদীনের তখন স্ফূর্ত্তি দেখে কে! সেই দৈত্যকে হুকুম দিয়ে এক সোনার অট্টালিকা তৈরী করালে এবং রাজকন্যার জন্য হীরে মুক্তো ও চুনিপান্না বসানো খাট বিছানা আসবাবপত্র আনিয়ে ঘর সাজিয়ে রাখলে।

এমন সময় একদিন রাত্রে হঠাৎ রাজবাড়ীতে সানাই বেজে উঠলো। আলাদীন খবর পেলে যে তাকে না জানিয়ে উজীরের ছেলের সঙ্গে রাজা চুপিচুপি তাঁর কন্যার আজ বিয়ে দিচ্ছেন। আর যায় কোথায়! তৎক্ষণাৎ আলাদীন দৈত্যকে ডেকে হুকুম দিলে, বাসরঘর থেকে উজীরের ছেলেকে টেনে ফেলে তার জায়গায় তাকে বসিয়ে দিয়ে আসতে।

যেমন কথা তেমনি কাজ!

সকালে উঠে রাজা বিস্মিত হ'য়ে দেখলেন, উজীরের ছেলে মরে পড়ে আছে নর্দ্দমার মধ্যে আর রাজকন্যার পাশে শুয়ে আছে আলাদীন। কিন্তু আলাদীনের পোশাক পরিচ্ছদ ও ঐশ্বর্য্য দেখে একে তো তিনি হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিলেন, তার ওপর তার সোনার প্রাসাদ দেখে তাঁর মাথা ঘুরে গেল। তখন তিনি অত্যন্ত খুশী হয়েই মেয়ে-জামাইকে আশীর্ব্বাদ করলেন।

বলা বাহুল্য, এর পর থেকে আলাদীনের দিন খুব সুখেই কাটছিল।

কিন্তু এমন সময় একদিন এক কাণ্ড ঘটল। আলাদীন যখন শিকার করতে শ্বশুরের সঙ্গে ভিন্ দেশে গিয়েছিল সেই অবসরে সেই বুড়ো জাদুগরটা তার বাড়ীর সামনে এসে হাঁকল, 'পুরানো পেতল লোহা বিক্রী করবে গো।' রাজকন্যা বা তাঁর দাসীরা কেউ জানত না সেই পিদিমটার গুণের কথা। আলাদীন সকলের কাছে সেই কথাটা গোপন রেখেছিল। তাই পুরানো পিদিমটা কি হবে মনে ক'রে রাজকন্যা সেটা দাসীদের হাতে দিয়ে বললেন তার বদলে একটা নতুন কিনে আনতে।

জাদুগর ঠিক এই মতলবেই সেখানে ঘুরছিল। সে আলাদীনের এই ঐশ্বর্য্য দেখে ব্যাপারটা পূর্ব্বেই অনুমান করেছিল। কাজেই তাড়াতাড়ি দাসীকে একটা চকচকে পিদিম দিয়ে সেই পুরানোটা সে হস্তগত করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে পিদিমটা ঘষে দৈত্যকে হুকুম করলে, সেই প্রাসাদসুদ্ধ তাকে উড়িয়ে নিয়ে আফ্রিকায় চলে যেতে। দৈত্য সঙ্গে সঙ্গে তার হুকুম তামিল করলে।

এদিকে রাজা ও আলাদীন শিকার থেকে ফিরে এসে দেখলে, যেখানে ওর বাড়ী ছিল সেখানে শুধু মাঠ ধূ ধূ করছে। রাজকন্যাও নেই, প্রাসাদও নেই। কি হ'লো, তারা কিছুই বুঝতে পারলে না। সবাইকে জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু কেউ কোন কথা বলতে পারলে না।

তখন আলাদীন সেই আংটিটা মাটিতে ঘষলে। সঙ্গে সঙ্গে আংটির দাস এসে হাজির হ'লো। সে তাকে নিয়ে যেতে বললে যেখানে রাজকন্যা ও তার অট্টালিকা আছে। আংটির দাস তাকে তখনই আফ্রিকায় নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে আলাদীন দেখলে সেই বুড়োটা রাজকন্যাকে পীড়াপীড়ি করছে, তাকে বিয়ে করবার জন্য। তখন গোপনে রাজকন্যার সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে আলাদীন তার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিল; আর তাই খেয়ে সেই জাদুগরটি মরে গেল। তারপর আবার তারা সেখান থেকে চীনে ফিরে গেল এবং সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করতে লাগল।

মহাকবি কালিদাস ও শকুন্তলা

মহাকবি কালিদাস ভারতবাসীর গৌরব। তিনি ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর কাব্যপ্রতিভার পরিচয় পেয়ে সমস্ত পৃথিবীর পণ্ডিতমণ্ডলী মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় এমন উচ্চাঙ্গের কবিতা, এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও মধুর রচনা আজ পর্য্যন্ত আর কোন কবি করতে সমর্থ হননি, তাই আজও সেখানে তাঁর আসন সকলের ওপরে, আজও কালিদাসের উপমার খ্যাতি পৃথিবীব্যাপী—মহাকবি কালিদাসের নাম আজও বিশ্বসাহিত্যে অম্লান হ'য়ে আছে।

কিন্তু তাঁর জন্মকাল নিয়ে এখন আমাদের দেশে দু'টি দলের সৃষ্টি হয়েছে। একদল বলেন তিনি জন্মেছিলেন গুপ্ত সম্রাটদের শাসনকালে ৩৮০ থেকে ৪১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। ম্যাকডোনেল প্রভৃতি পণ্ডিতেরা গবেষণা ক'রে স্থির করেছেন যে, মহারাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যিনি সুদূর উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত জয় ক'রে বিক্রমাদিত্য উপাধি লাভ করেন, কালিদাস তাঁরই সমকালীন কিংবা তাঁর ছেলে কুমার গুপ্তের বা নাতি স্কন্দগুপ্তের সভাকবি ছিলেন। অর্থাৎ তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের লোক।

অথচ ম্যাক্‌সমুলার, ফ্যারগুসান্ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, তিনি ষষ্ঠ শতকের লোক। তাঁরা বলেন কালিদাস ছিলেন যশোধর্ম্মন বিক্রমাদিত্য—যিনি 'বিক্রমসম্বৎ' প্রচলন করেছিলেন, তাঁরই সভাকবি। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ আমাদের দেশের বহু পণ্ডিত এই মতেরই পক্ষপাতী। আবার স্যার উইলিয়াম জোনস্ প্রভৃতি একাধিক পণ্ডিতের মত যে, তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকের কবি। এই ভাবে কালিদাসের কাল নিয়ে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে এবং আজ পর্য্যন্ত তার কোন মীমাংসাই হয়নি। তবে এবিষয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই শ্রেয়। তিনি লিখেছেন—

"হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল,
হারিয়ে গেছে সে সব অব্দ ইতিবৃত্ত আছে স্তব্ধ
গেছে যদি আপদ গেছে, মিথ্যা কোলাহল।"

সুতরাং ও বিবাদ বন্ধ রেখে এইখানে তোমাদের মহাকবি কালিদাসের শ্রেষ্ঠকীর্ত্তি 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এর গল্পটি সংক্ষেপে বলবো।

শকুন্তলা কণ্বমুনির পালিতা কন্যা। তপোবনে মানুষ—সেখানকার গাছপালা লতাপাতা, হরিণশিশু তার খেলার সাথী—অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা তার সখী।

তপোবন চির শান্তিময়! সেখানে হিংসাদ্বেষ নেই, কোন ভেদাভেদ নেই। তাপস বালকেরা বন থেকে কাঠ কেটে আনে, যজ্ঞের সমিধ জোগাড় করে। বালিকারা পুষ্পচয়ন করে, কলসী ক'রে জল এনে গাছে দেয়। আশ্রমের যাবতীয় কাজ তারা করে। মহামুনি কণ্ব শুধু যাগযজ্ঞ করেন—তিনি সকলের শিক্ষাগুরু পিতৃস্থানীয়।

একবার তিনি আশ্রমের ভার শিষ্য-শিষ্যাদের ওপর দিয়ে কিছু-দিনের জন্য গিয়েছিলেন ভিন্ন রাজ্যে যজ্ঞ করতে। সেই সময় একদিন মহারাজা দুষ্মন্ত একটা হরিণের পিছনে ছুটতে ছুটতে একেবারে তপো-বনের মধ্যে এসে পড়লেন। তপোবনে জীবহত্যা নিষিদ্ধ। তাই আশ্রমবাসীরা সবাই দুষ্মন্তকে সেই কার্য্য থেকে বিরত হ'তে বললেন। তিনি ক্ষান্ত হলেন। কিন্তু পথশ্রমে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন তাই দেখে আশ্রমবাসীরা তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য মহারাজা দুষ্মন্তকে অনুরোধ করলেন। তিনিও তাদের কথা রাখলেন।

অতিথিসেবার ভার ছিল শকুন্তলা ও তার দু'জন প্রিয়সখী—অনসূয়া

ও প্রিয়ম্বদার ওপর। দুষ্যন্ত তাদের সেবা যত্নে অতিশয় তুষ্ট হলেন। এবং সেই অদ্ভুত রূপবতী শকুন্তলাকে দেখে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন সখীদ্বয়কে।

তারা বললে, শকুন্তলা মহাতপা বিশ্বামিত্র ও স্বর্গের অপ্সরী মেনকার কন্যা। কণ্বমুনি একে কন্যার স্নেহে পালন করেন এই তপোবনে।

তখন আর কোন বাধা রইল না। সেখানে তিনি গন্ধর্ব্বমতে শকুন্তলাকে বিয়ে করলেন এবং তাঁর হাত থেকে একটি আংটি খুলে শকুন্তলার হাতে পরিয়ে দিয়ে নিজেও রাজ্যে ফিরে গেলেন।

এদিকে দুষ্যন্ত চলে যাবার পরই দুর্ব্বাসা ঋষি আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। শকুন্তলা তখন স্বামীর চিন্তায় এমন বিভোর যে শুনতেই পেলে না তাঁর ডাক। তখন আশ্রমবাসীদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ছিল অতিথিসৎকার করা। ফলে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে দুর্ব্বাসা তাকে অভিসম্পাত দিলেন, 'যার চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে তুই আজ অতিথিসৎকার করতে ভুলে গেলি, সে তোকে ভুলে যাবে, দেখলে চিনতে পারবে না।'

মুনি ঋষির কথা বিফল হবার নয়। তাই দুর্ব্বাসার এই অভিশাপ শুনতে পেয়ে অনসূয়া প্রিয়ম্বদার বুক কেঁপে উঠলো। তারা ছুটে এসে সখীর হ'য়ে ঋষির পায়ে ধরে মাপ চাইলে।

কিন্তু ঋষি বললেন, আমি একবার মুখ দিয়ে যা উচ্চারণ করেছি তা সত্য হবেই। তবে তোমাদের অনুরোধে এইটুকু করতে পারি যে, প্রিয়জনের কোন 'অভিজ্ঞান' বা চিহ্ন দেখাতে পারলে তবে সে চিনতে পারবে। সখীরা তখন নিশ্চিন্ত হ'লো। কেননা দুষ্যন্তর হাতের আংটি ছিল শকুন্তলার কাছে, তা তারা জানতো।

এইভাবে আরও কিছুদিন কেটে যাবার পর কণ্বমুনি আশ্রমে ফিরলেন। তিনি আগেই সব শুনেছিলেন। তাই আনন্দে শকুন্তলাকে

আশীর্ব্বাদ করলেন এবং শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার আয়োজন করতে লাগলেন।

এদিকে হ'লো কি, শকুন্তলা যখন দুষ্মন্তর রাজধানীতে গিয়ে পৌঁছল তখন তিনি কিছুতেই তাকে চিনতে পারলেন না। ফলে স্ত্রী ব'লে শকুন্তলাকে গ্রহণ করতে তিনি অস্বীকার করলেন। তখন তাড়াতাড়ি সেই আংটিটা দেখাতে গিয়ে শকুন্তলা আর সেটা খুঁজে পেল না। রাজা তখন ঘরে আশ্রয় না দিয়ে অতিথিশালায় থাকতে বললেন। এই অপমান সহ্য করতে না পেরে শকুন্তলা কাঁদতে লাগল। তখন স্বর্গ থেকে মেনকা এসে তাকে নিয়ে চলে গেলেন।

বেচারী শকুন্তলা! দুষ্মন্তর রাজধানীতে এসে পৌঁছে সে নদীর জলে হাত পা ধুতে গিয়েছিল। সেই সময় আংটিটা তার হাত থেকে জলে পড়ে যায় এবং মাছে সেটা খেয়ে ফেলে। এ কথা সে জানতেই পারেনি, তাই এত দুঃখ ভোগ করলে। দুর্ব্বাসার অভিসম্পাত হাতে হাতে ফললো।

যাই হোক এই ঘটনার কিছুদিন পরেই এক কাণ্ড হ'লো, একটা জেলেকে চোর ব'লে রাজকর্ম্মচারীরা ধরে আনলে রাজার কাছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে রাজার আংটি চুরি করেছে।

জেলে বললে, মাছের পেট থেকে সে আংটিটা পেয়েছে।

রাজা তখন আংটিটা দেখেই চিনতে পারলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ে গেল সব কথা। শকুন্তলাকে তিনি যে অপমান করেছেন, তার জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন এবং অনেক কষ্টে আবার শকুন্তলাকে ফিরে পেলেন নিজের কাছে।

এ ছাড়া 'মেঘদূতম্' 'কুমারসম্ভবম্' 'রঘুবংশম্' প্রভৃতি আরও বহু কাব্য কালিদাস রচনা করেছেন। তোমরা বড় হ'লে নিশ্চয়ই সেগুলো পড়বে। এর প্রত্যেকটি সাহিত্যের রত্ন বিশেষ।

সারভেন্‌টিস্‌ ও ডন্‌কুইক্‌সট

এইবার আমরা যাবো স্পেনের সবচেয়ে উঁচু ও সমতল স্থানে—যেখানে গ্রীষ্মকালে অগ্নিবৃষ্টি হয়, আর শীতের সময় ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাওয়া বয়। এই রকম এক জায়গায় স্পেনের রাজধানী ম্যাড্রিড। ম্যাড্রিডের উত্তরপূর্ব্ব দিকে, প্রায় সতের মাইল দূরে একটি খুব ছোট শহর আছে তার নাম 'এল্‌কালা'। আকারে অতি নগণ্য হলেও এক বিষয়ে সেই স্থানটি ম্যাড্রিডের চেয়েও বেশী বিখ্যাত ছিল। কারণ স্পেনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক 'মিগুয়েল ডি সারভেন্‌টিস্‌' বা থেরভান্‌তেস্‌ সেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দের কথা।

মিগুয়েলের পিতা ছিলেন শহরের একজন নাম করা ডাক্তার। তিনি ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে নিজে কঠিন পরিশ্রম করতেন দিনরাত। কিন্তু ছেলেটির মোটে পড়াশুনার দিকে ঝোঁক ছিল না। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মনে একটা দুঃসাহসিক কিছু করবার স্পৃহা দেখা যেতো। যে জীবনে আছে নিত্য নতুন কর্ম্মের প্রেরণা, যে জীবনে আছে আবিষ্কারের সন্ধানে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো, সেই রকম জীবন তিনি ভালবাসতেন।

তাই একদিন মিগুয়েল দেশ থেকে বিরাট শহর ম্যাড্রিডে চলে গেলেন এবং যখন মাত্র কুড়ি বৎসর বয়স তখন সৈনিক শ্রেণীতে নাম লেখালেন। এই সূত্রে প্রথম তাঁর রোমে যাত্রা করবার সুযোগ মিলল। তাঁর বাল্যের ইচ্ছা পূর্ণ হ'লো—এই দুঃসাহসিক জীবনযাত্রা দিয়ে।

কিন্তু যাঁর মধ্যে সাহিত্যের প্রেরণা সুপ্ত রয়েছে, তিনি বেশী দিন সেই দুঃসাহসিক কার্য্য নিয়ে সুখী হ'তে পারলেন না। তুর্কীরা যে সময় ইউরোপের দক্ষিণে আক্রমণ চালিয়েছিল, স্থলে ও জলে তাদের সৈন্যরা ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সেই সময় তাদের বিরুদ্ধে এক বিরাট যুদ্ধ ঘোষিত

হ'লো। ইতালীর দক্ষিণে মেসিনাতে ইউরোপের ক্রিশ্চিয়ান জাতির অধিকাংশ রণতরী এসে মিলিত হ'লো। এই বিপুল সৈন্যবাহিনীর নেতা হলেন অস্ট্রীয়ান ডন্ জন্। তিনি স্পেনের রাজার সহোদর ভাই—বীর ও যোদ্ধা।

সেই রণতরীর একটিতে নগণ্য সৈনিকরূপে সারভেন্‌টিস্ যাত্রা করলেন ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে। তাঁর এই জাহাজটির নাম হ'লো "মারকোয়েসা"।

যখন ক্রিশ্চিয়ানদের রণতরীগুলি এসে পৌঁছল লিপানটোর শত্রু-বাহিনীর কাছে, সারভেন্‌টিস্ তখন জ্বরে অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে বার বার অনুরোধ করলেন জাহাজের নীচে গিয়ে শুয়ে থাকতে, কিন্তু তিনি কারো কথায় কান না দিয়ে জাহাজের ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে রইলেন। যুদ্ধ যখন ভীষণ থেকে ভীষণতর হ'য়ে উঠলো, সেই সময় তিনটি কামানের গোলার আগুন এসে লাগল সারভেন্‌টিসের দেহে। সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গাগুলি ঘায়ে পরিণত হ'লো—দু'টি বুকে এবং একটি তাঁর ডান হাতে। ঘাগুলো অবশ্য খুব সামান্যই হয়েছিল। কিন্তু এ থেকে তাঁর ডান হাতটা চিরকালের মত বিকল হ'য়ে গেল।

সারভেন্‌টিসের মন আনন্দে ভরে উঠলো যখন তিনি শুনলেন যে তুর্কীদের সমস্ত রণতরী ধ্বংস হয়েছে এবং তাদের লোকজন ও জিনিস-পত্রের এত ক্ষতি হয়েছে যে, আর এক পুরুষের মধ্যে তারা কোনদিন যুদ্ধ করতে পারবে না ইউরোপে।

যদিও সারভেন্‌টিসের ডান হাত গিয়েছিল, তবুও বাঁ হাতে যুদ্ধ ক'রে এর পর তিনি তাঁর পূর্ব্ব যশ বরাবর অক্ষুণ্ণ রেখে ছিলেন। সৈনিক হিসাবে তাঁর বেশ নাম হয়েছিল।

তারপর তিনি আরো কয়েকটা অভিযান করেছিলেন ইতালীতে এবং সবগুলোতেই ভালভাবে উতরে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই সময়

থেকেই তাঁর মনে সৈনিক জীবনের প্রতি কেমন একটা বিতৃষ্ণা এলো। বোধ হয় তখনই তাঁর মনে সেই সব কল্পনার মুকুল ধরেছিল, যা একদিন প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠেছিল তাঁর বিখ্যাত বইগুলিতে।

১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁকে স্পেনে ফিরে যাবার জন্য ছুটি দেওয়া হ'লো। তিনি নেপ্‌লস্ যাত্রা করলেন।

কিন্তু 'ওডিসিউস্'-এর মত তাঁরও বহুদিন লেগেছিল দেশে পৌঁছতে। কারণ যাবার পথে ফ্রান্সের দক্ষিণে, মার্সেলস্ থেকে বহুদূর এক জায়গায় জলদস্যুরা তাঁর জাহাজ আক্রমণ করে। সেই সময় ভূমধ্য-সাগরের এই জলদস্যুদের নাম শুনলে লোক ভয়ে শিউরে উঠত। সারভেন্‌টিস্ ও তাঁর সঙ্গীরা সেই ভীষণ জলদস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে তাদের হাতে বন্দী হলেন। তখন জলদস্যুরা আফ্রিকার উত্তরে 'আলজিয়ারস্'-এ নিয়ে গিয়ে তাঁদের ক্রীতদাসরূপে বিক্রী ক'রে দিলে।

সেখানে পাঁচ বৎসর তিনি মূরদের দাস হ'য়ে ছিলেন। এই পাঁচ বছরের ইতিহাস এমন উত্তেজনাপূর্ণ যে, গল্পসাহিত্যে তার তুলনা হয় না।

সেই বিকলাঙ্গ সৈনিকটি বন্ধনের মধ্যে থেকেও চুপ ক'রে বসে থাকবার মত লোক ছিলেন না। বার বার তিনি সেখান থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রত্যেকবারেই ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য এর জন্যে মূরদের হাতে তাঁকে অশেষ লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল! তারা কখনো তাঁকে হাজার বেত মেরেছে, কখনো বা মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখিয়েছে, কিন্তু তবুও তাঁর কিছুই করতে পারেনি। তাঁর অদম্য উৎসাহ ও অসীম সাহস কখনই তাদের শাসন মেনে নেয়নি।

এমন কি মূররা পর্য্যন্ত তাঁর এই তেজস্বিতা দেখে এত মুগ্ধ হ'য়ে

গিয়েছিল যে, তাঁর প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারেনি। পাশা বা তাদের শাসনকর্ত্তা সারভেন্‌টিস্‌কে নিজের দলে টেনে নিয়েছিলেন এই কথা ভেবে যে, যতদিন এই বিকলাঙ্গ স্পেনীয় লোকটি তাঁর কাছে নিরাপদে থাকবে, ততদিন তাঁর লোকজন, জাহাজ, এমন কি দেশ পর্য্যন্ত সুরক্ষিত থাকবে।

অবশেষে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে দু'হাজার মুদ্রা দিয়ে তাঁর দেশের লোকেরা তাঁকে মূরদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে যায়। এইভাবে আবার তিনি স্পেনে ফিরে যান।

মূরদের মধ্য থেকে সারভেন্‌টিস্ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তাতে তাঁর আর দুঃসাহসিক জীবনের প্রতি স্পৃহা ছিল না। তাই তিনি ম্যাড্রিডে ফিরে গিয়ে নীরবে বসবাস করতে লাগলেন এবং জীবিকা অর্জ্জনের জন্য তরবারি ছেড়ে কলম ধরলেন। কিন্তু লেখক হিসাবে প্রথম প্রথম তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করতে পারেননি।

শেষে ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি 'সেভিলে'-এ চলে গেলেন। এবং সেখানে গিয়ে রসদ জোগাবার একটা চাকরী জোগাড় ক'রে নিলেন। কিন্তু এতে এত অল্প উপার্জ্জন হ'তে লাগল যে, গভীর দারিদ্র্যের মধ্যে তিনি পড়ে গেলেন। কথিত আছে, এই সময় বহুবার নাকি দেনার দায়ে তাঁকে জেলে পর্য্যন্ত যেতে হয়েছিল।

কিন্তু রাত্রির অন্ধকার যখন গভীর হ'য়ে ওঠে, তখন সকাল হতেও আর বেশী দেরী থাকে না। তাই যখন তিনি 'সেভিলে'-এর জেলে বন্দী ছিলেন, সেই সময় এমন একটা অদ্ভুত বইয়ের কল্পনা তাঁর মাথায় গেল, যা একদিন তাঁকে খ্যাতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে তুলে দিলে। তিনি সেখানে লিখতে আরম্ভ করলেন।

১৬০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর সেই অমর উপন্যাস 'ডন্ কুইক্‌সট্' প্রকাশিত হ'লো। সঙ্গে সঙ্গে সেই বই এমন অদ্ভুত সাফল্য লাভ করলে যে, দেখতে

দেখতে সংস্করণের পর সংস্করণ নিঃশেষ হ'য়ে গেল। স্পেনের প্রত্যেক লোক—সম্রাট থেকে দরিদ্র পর্য্যন্ত সেই ক্ষ্যাপা সৈনিকের বীরত্বের কাহিনী পড়ে হেসে কুটি কুটি হ'তে লাগল।

এর দশ বৎসর পরে আবার ওই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হ'লো। প্রথম খণ্ডের চেয়ে দ্বিতীয় খণ্ডটি আরো ভালো এবং আরো চিত্তাকর্ষক!

১৬১৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল এই বিখ্যাত সাহিত্যিকটি পরলোক-গমন করেন।

তাঁর 'ডন্ কুইক্‌সট্'-এর গল্পটি সংক্ষেপে হ'লো এই—

স্পেনের কাছে একটি ছোট্ট জায়গা ছিল, তার নাম লা মাঞ্চা। সেখানে একজন ক্ষ্যাপা সৈনিক বাস করতো, তার নাম ডন্। সেই সৈনিকটি এত সেকেলে উপন্যাস পড়েছিল—বিশেষ ক'রে যে সব নাইট বা বীররা দুঃসাহসিক কাজ ক'রে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায় তাদের কাহিনী—যে, সেও সেই রকম জীবনযাত্রার অনুকরণ করবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগল এবং একদিন সত্যি সত্যিই বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। সে সব দিন যে বহু যুগ আগে কেটে গেছে, সে কথা একবারও তার মনে হ'লো না।

তাই যাবার আগে সে একটি পুরনো মরচে ধরা যুদ্ধের পোষাক ও 'রসিন্যাণ্ট' নামে একটা বুড়ো ঘোড়া জোগাড় করলে। তারপর সাঙ্কো-পাঞ্জা নামে একটি চাষাকে সঙ্গে নিলে তার সেবক ক'রে। তারপর চাই এক রাজকন্যা—সে বেছে নিলে মনে মনে একটি চাষার মেয়েকে, তার নাম দিলে 'ডালসিনিয়া'। মেয়েটি কিন্তু এসব কথা কিছুই জানলে না।

যাই হোক, এইভাবে লোকজন নিয়ে সুসজ্জিত হ'য়ে সে যাত্রা করলে এবং কতকগুলি অত্যন্ত হাস্যকর ও দুঃসাহসিক কার্য্যের মধ্যে গিয়ে পড়লো। সম্ভবতঃ এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হ'চ্ছে সেই হাওয়ায়

চালিত কলগুলি, যাকে দেখে তার প্রথমে মনে হয়েছিল বুঝি কতকগুলো দৈত্য হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে তেড়ে আসছে। আর এই ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে সে বীরের মত সেই কলগুলিকে আক্রমণ করলে—ফলে তার নিজেরই দুর্দ্দশার অবধি রইল না।

'ডন্ কুইক্‌সট্'-এর গল্প পড়ে হাসা খুব সহজ কিন্তু সেটাই তার মধ্যে সব নয়। সারভেন্‌টিস্ খুব বড় একজন হাস্যরসস্রষ্টা তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্যান্য বিখ্যাত হাস্যরসস্রষ্টাদের মত তাঁরও আবার মানুষের প্রতি গভীর দরদ ছিল।

বৃদ্ধ ডন একটু মাথা-পাগলাগোছের কল্পনাবিলাসী লোক হ'লেও সে ছিল একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। তার অন্তঃকরণে আমরা দেখতে পাই, একদিকে যেমন মহৎ অনুপ্রেরণা তেমনি অন্যদিকে অদম্য সাহস ও উচ্চ আদর্শের প্রতি মোহ। এর জন্যে বহুবার হয়তো সে লাঠি খেয়েছে, জেলে গিয়েছে এবং লোকের কাছে উপহাসাস্পদ হয়েছে, কিন্তু তাতে কি এসে যায়? সে বরাবর এগিয়ে গিয়েছে ধীর ও স্থিরভাবে অত্যাচারিত ও প্রপীড়িত লোকদের সাহায্য করতে এবং সেইজন্যই সে শেষকালে আমাদের সত্যিকারের ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করতে পেরেছে।

তার মৃত্যুর গল্পটি অত্যন্ত শোচনীয় ও বিয়োগান্ত। যখন সে ভগ্নোৎসাহ হ'য়ে বাড়ীতে ফিরে এল এবং তার সেই নির্ব্বুদ্ধিতার কথা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পেরে মরে গেল, তখন সত্যিই চোখের জল রাখা যায় না।

এই সমস্ত গুণের জন্য আজও ডন্ কুইক্‌সট্ বিশ্বসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। এর মধ্যে যে প্রহসনের মত হাসির ফোয়ারা ছুটেছে, তার জন্য নয় নিশ্চয়ই!

শেক্সপীয়ার

এইবার আমরা শেক্সপীয়ারের কথা বলবো। তিনি ইংল্যাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক—কবি ও নাট্যকার।

ইংল্যাণ্ডের এভন্ নদীর তীরে স্ট্র্যাটফোর্ড ব'লে একটি গ্রাম আছে, সেখানে এক দরিদ্রের ঘরে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল শেক্সপীয়ার জন্মগ্রহণ করেন।

ছেলেবেলায় তিনি লেখাপড়া করবার বিশেষ সুযোগ পাননি, কারণ তাঁদের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। কিন্তু পুঁথিপড়া বিদ্যা বেশী না থাকলেও, তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ছিল। তাই যে কোন জিনিস একবার দেখলেই তার ভালোমন্দ তিনি তৎক্ষণাৎ বিচার করতে পারতেন। তা ছাড়া প্রত্যেক লোকের প্রতি তার অসীম সহানুভূতি ছিল। কোন জিনিষ বা লোককে তিনি কখনও অবহেলা করতেন না। তাঁর সাহিত্যের মধ্যে তাই এই স্বভাবটি ফুটে উঠেছে অদ্ভুতভাবে। সকল শ্রেণীর মানুষের চরিত্র অঙ্কনে তিনি যে নিপুণতা দেখিয়েছেন, তা যেমন অসাধারণ তেমনি অতুলনীয়। কোন একজন লোকের এত অদ্ভুত প্রতিভা শেক্সপীয়ারের পূর্ব্বে বিশ্ব-সাহিত্যে আর দেখা যায় না। এখন একমাত্র আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর খানিকটা তুলনা হয়। রবীন্দ্রনাথের নিত্য নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা দেখে আমরা যেমন বিস্মিত হই, শেক্সপীয়ারের সাহিত্য পড়তে পড়তেও তেমনি হয় আমাদের মনের ভাব।

তবে একটা কথা এখানে মনে রাখা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন যে, শেক্সপীয়ার যখন ইংল্যাণ্ডে জন্মান, তখন সেখানে উল্লেখযোগ্য আর কোন সাহিত্যই ছিল না। সম্পূর্ণরূপে নিজের প্রতিভার দ্বারা তিনি আপন সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন।

তাঁর আগে ইংল্যাণ্ডের সাহিত্য বলতে ছিল শুধু 'বিউল্‌ফ্‌'-এর মহাকাব্য 'ক্যাড্‌ম্যানের স্তোত্র' ও বাইবেলের কবিতা, 'চসারে'র 'কেন্‌টারবারী টেলস'-এর গল্প এবং 'এড্‌মাণ্ড্‌ স্পেনসারে'র পাণ্ডিত্য-পূর্ণ দীর্ঘ কবিতা 'ফেয়ারী কুইন' প্রভৃতি।

তা ছাড়া নাটক বলতে সকলের প্রথমে যা ইংল্যাণ্ডে ছিল তাকে বলা হ'তো 'মিসট্রি্স'। ছোট ছোট নাটকীয় ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে চার্চ্চের পুরোহিতরা এতে অভিনয় করতেন। অবশ্য বাইবেল থেকেই অভিনয় উপযোগী ঘটনা বেছে নেওয়া হ'তো এবং সেইগুলো বিশেষ বিশেষ পর্ব্বদিনে সাধারণের সম্মুখে দেখানো হ'তো। যেমন ইষ্টারের দিন একটি ছোট দৃশ্যের অভিনয় হ'তো তাতে দেখানো হ'তো যীশুখৃষ্টের সমাধির ওপর একটি দেবদূতকে। এবং এই সব অভিনয় করতো জনসাধারণ।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে ইংল্যাণ্ডের প্রথম নাটক হ'লো 'মিসট্রি্স'। তাদের 'মিসট্রি্স' বলা হ'তো এই জন্য যে, স্বর্গের ঘটনাবলীকে অবলম্বন ক'রে যে নাটক লেখা হ'তো তা পৃথিবীর লোকেরা বুঝতে পারবে না অর্থাৎ মানুষের জ্ঞানের বাইরে থাকবে, সেটা তাঁরা আগে থাকতেই ধরে নিতেন।

এই 'মিসট্রি্স'-এর পর আর এক রকমের নাটক জন্মালো তাকে বলা হ'লো 'মিরাকেল প্লে'।

তারপর এই দু'য়ের সংমিশ্রণে একরকম নতুন নাটকের সৃষ্টি হ'লো তার নাম 'মরালিটি প্লে'। এই 'মরালিটি প্লে'-র বিষয়বস্তু প্রতিদিনের ঘটনা থেকেই নেওয়া হ'তো এবং চরিত্রগুলির নাম দেওয়া হ'তো পাপ ও পুণ্যের নাম থেকে। তাছাড়া সমস্ত নাটকটির মধ্যে একটা নীতিমূলক উপদেশ থাকতো।

এই রকম নাটকে চরিত্রগুলির নাম যদিও থাকত অবাস্তব তবুও তাদের অভিনয় কিন্তু বাস্তব নরনারীর মতই হ'তো।

এমন সময় হ'লো শেক্সপীয়ারের অভ্যুদয়।

আঠারো বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেন এনি হ্যাথওয়ে বলে একটি রমণীকে। তারপর দু' বছর পরে বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি একটি ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারের দলে যোগ দেন। কাপড় টাঙ্গিয়ে, বাঁশ বেঁধে তক্তপোষের ওপর তখন অভিনয় হ'তো। এখনকার মত বাঁধা-স্টেজ ছিল না, দর্শকদের আকাশের নীচে বসে অভিনয় দেখতে হ'তো।

তারপর ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে কবি ও নাট্যকার বলে শেক্সপীয়ারের নাম ছড়িয়ে পড়লো। তিনি নিজে অভিনেতা ছিলেন কিন্তু খুব ভাল অভিনয় করতে পারতেন না। তাই নিজে নিজের জন্য কখনো ভাল পার্ট লেখেননি—লিখেছিলেন অন্য অভিনেতাদের জন্য। প্রথম থেকেই তিনি জানতেন যে বড় পার্ট তাঁর জন্য নয়।

লণ্ডনে এসে তিনি প্রচুর অর্থ ও যশ অর্জ্জন করলেন। তিনি নিজে যে থিয়েটারের দলে ছিলেন তাদের জন্য নাটক লিখতে লাগলেন হুড় হুড় ক'রে। তার ফলে লণ্ডনের যে সব থিয়েটারে তাঁর শেয়ার ছিল, তা থেকে তিনি বহু টাকা পেতে লাগলেন।

এই সময় গ্লোব নামে একটি থিয়েটার পুড়ে যায়। এই থিয়েটারে তখন তাঁর রচিত 'অষ্টম হেনরী' নাটকটির অভিনয় হচ্ছিল। তা ছাড়া সেখানে তাঁর অনেক টাকার শেয়ার ছিল। এতে অবশ্য ক্ষতি খুবই হয়েছিল কিন্তু তখন শেক্সপীয়ারের আয় এত বেশী যে তিনি বিশেষ গ্রাহ্য করলেন না।

শেষ বয়সটা তিনি নিজের দেশে কাটিয়েছিলেন সুখ ঐশ্বর্য্য সম্মান ও প্রতিপত্তির সঙ্গে।

এখনও যদি তোমরা বিলেতে যাও তো 'স্ট্র্যাটফোর্ডে'র চার্চ্চের বেদীর সামনে দেখবে শেক্সপীয়ারের সমাধি রয়েছে। তিনি মারা যান ২৩শে এপ্রিল, ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে।

শেক্সপীয়ার সবসুদ্ধ রচনা করেছিলেন সাঁইত্রিশটি নাটক, দু'টি দীর্ঘ কবিতা ও একশো চুয়ান্নটি ছোট কবিতা। এই ছোট কবিতাগুলির প্রত্যেকটি চোদ্দ লাইনে লেখা—এদের নাম 'সনেট'।

শেক্সপীয়ারের নাটকগুলির মধ্যে কতকগুলি খুব গম্ভীর ও করুণ। আবার কতকগুলি খুব সরস ও মধুর। তার মধ্যে সতেরোটি হ'লো সরস, তাদের বলে 'কমেডিস' ; আর দশটি হ'লো করুণ, তাদের নাম 'ট্রাজেডিস'। এ ছাড়া বাকী দশটিকে ঐতিহাসিক নাটক বলা হয়।

তাঁর 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস্' নাটকটি ছেলেদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তা ছাড়া 'এজ ইউ লাইক ইট', 'মিড্ সামার নাইটস্ ড্রিম' এবং 'দি টেম্পেষ্ট' সবগুলিই ছোটরা খুব ভালবাসে।

'দি টেম্পেষ্ট' নাটকটি শেক্সপীয়ারের শেষ রচনা এবং সবদিক দিয়ে তাঁর সুসম্পূর্ণ রচনাও বলা যেতে পারে। অনেকে মনে করেন যে, এর মধ্যে তিনি নিজেকে বৃদ্ধ প্রস্পেরোরূপে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাঁর কলম ফেলে রেখে দিয়ে শান্তিতে স্ট্র্যাটফোর্ডের বাড়ীতে গিয়ে বিশ্রাম করতে চাইছেন।

'টেম্পেষ্ট'-এর গল্পটি সংক্ষেপে বলি—

প্রস্পেরো বলে একজন লোক তাঁর মেয়ে মিরান্দাকে নিয়ে বাস করতেন এক নির্জ্জন দ্বীপে। সেখানে আর কোন মানুষ ছিল না—শুধু এই বাপ আর মেয়ে। পর্ব্বতের এক গুহার মধ্যে তাঁরা থাকতো গাছের ফলমূল খেয়ে। এমন সময় হঠাৎ একদিন প্রস্পেরোর মনে হ'লো বাতাসে যেন কাদের কান্নার সুর ভেসে আসছে।

তিনি জাদু মন্ত্র জানতেন। তার দ্বারা তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন যে, এ কান্না পরীদের। সেই দ্বীপে কিছুকাল আগে এক ডাইনী বাস করতো, সে মন্ত্রবলে এই সব পরীদের গাছের মধ্যে বন্দী ক'রে রেখে দিয়েছিল। সেই ডাইনীটা তখন মরে গিয়েছিল, তাই

প্রস্‌পেরো গিয়ে যেই একটা গাছ কাটলেন, অমনি তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এল এরিয়েল বলে এক পরী। সে অন্য সব পরীদের নেতা, তাকে উদ্ধার করবার জন্য সে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হ'লো প্রস্‌পেরোর কাছে এবং বললে, আজ থেকে তুমি যা হুকুম করবে তাই করবো।

প্রস্‌পেরো একদিন এরিয়েলকে ডেকে বললেন, সমুদ্রে ঝড় তুলে একটা নৌকাকে ডুবিয়ে দিতে। সেই নৌকাতে যাচ্ছিলেন 'নেপলস্‌'-এর রাজা ও তাঁর ছেলে ফার্দ্দিনান্দ। এ ছাড়া এন্‌টনিও।

এই এন্‌টনিও হলেন মিলানের ডিউক এবং প্রস্‌পেরোর ভাই। এন্‌টনিও একবার বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে 'নেপলস্‌'-এর রাজার সাহায্যে তাঁর দাদা প্রস্‌পেরোকে রাজ্যচ্যুত করেন। তারপর এই ভ্রাতৃবৎসল, সদাশয় দাদাকে প্রাণে বধ না ক'রে একটা ভাঙ্গা নৌকা ক'রে তিনি সমুদ্রের ওপর ভাসিয়ে দেন। প্রস্‌পেরো তাঁর একমাত্র শিশুকন্যা মিরান্দাকে বুকে ক'রে রাজ্যত্যাগ করেন। সে ছাড়া তাঁর আর পৃথিবীতে আপন বলতে কেউ ছিল না।

এইভাবে ভাসতে ভাসতে একটা দ্বীপে এসে তিনি ওঠেন এবং সেইখানেই বসবাস করতে থাকেন। এমনি ক'রে বহু বৎসর কেটে যায়।

তাই এতদিন পরে প্রতিহিংসা নেবার এই সুযোগ পেয়ে প্রস্‌পেরো আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তবু এরিয়েল যখন চলে যেতে উদ্যত হ'লো, তখন তিনি তাকে বলে দিলেন, শুধু ফার্দ্দিনান্দকে ধরে আনতে, আর অন্য সকলকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখতে। এরিয়েল ফার্দ্দিনান্দকে ধরে আনলে, আর বাকী সকলকে জলে ডুবিয়ে যথেষ্ট নাকাল করলে।

মিরান্দা তার বাপকে ছাড়া জীবনে আর কোন মানুষ কখনো দেখেনি। অপরূপ সুন্দরী সে। এবং বিয়ের বয়েসও তার হয়েছিল। তাই দুশ্চিন্তায় বুড়োর চোখে ঘুম ছিল না।

এদিকে ফার্দিনান্দ মিরান্দার রূপ দেখে এমনি মুগ্ধ হ'য়ে গেল যে, তাকে বিয়ে করবার জন্য প্রস্‌পেরোকে অনুরোধ জানালে। প্রস্‌পেরো এই কথা শুনে তাকে তৎক্ষণাৎ বন্দী ক'রে ফেললেন। মিরান্দা তার বাবাকে অনেক অনুনয় বিনয় করলে তাকে ছেড়ে দেবার জন্য। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না। এদিকে বিনাদোষে একজন যুবককে শাস্তি দেওয়ার কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে, বাপের ওপর মিরান্দার ভারি রাগ হ'লো।

কিন্তু এই রাগ তার গলে জল হ'য়ে গেল যখন সে শুনলে যে, তার সঙ্গেই বিয়ে দেবার জন্য প্রস্‌সেরো তাকে ধরে এনেছিলেন। এইভাবে তাদের বিয়ে হ'য়ে গেলো। এন্‌টনিও ও নেপলস্‌-এর রাজা তখন মিরান্দার বাপের কাছে এসে ক্ষমা চাইলেন এবং তাঁকে আবার রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন।

জিন্ জ্যাক্‌স্ রুশোর আত্মজীবনী

বহু লোক লিখেছিলেন আত্মজীবনী, অর্থাৎ নিজের জীবনের কাহিনী। কিন্তু খুব কম লোক বিখ্যাত সাহিত্যিক জিন্ জ্যাক্‌স্ রুশোর মত মনের ভাব নিয়ে লিখতে পেরেছেন। কারণ লিখতে বসে প্রায় সকলেই তাঁর জীবনের ভাল ভাল ঘটনাগুলির শুধু উল্লেখ করেন, আর খারাপগুলির কথা চেপে যান। কিন্তু রুশো সে রকম করেননি। তিনি তাঁর জীবনের ভালো এবং মন্দ ঘটনাগুলি সমানভাবে বর্ণনা করেছেন এই বইতে। নিজের নীচতা, কাপুরুষতা ও অন্যায় কাজগুলির উল্লেখ করতে তিনি একটুও ইতস্তত: করেননি। বইখানির নাম কন্‌ফেশন, অর্থাৎ তিনি এই বইখানিকে তাঁর জীবনের স্বীকারোক্তি বলেছেন। রুশো তাঁর এই আত্মজীবনীতে সরলভাবে এমন সব

সত্যকথা লিখেছেন যে, তার জন্যই এই বইখানি আজও পৃথিবীর মধ্যে অত্যন্ত সমাদর লাভ করে।

তিনি এমন সব অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য ঘটনার কথা তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন যে, লোকে ভাবে, হয় সেগুলি মিথ্যা, নয় রুশোর মাথায় একটু পাগলের ছিট ছিল।

১৭১২ খৃষ্টাব্দে রুশো জেনেভাতে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে বহুবার বহু স্থানে চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি নিজের উপযুক্ত কাজ একটাও খুঁজে পেলেন না এবং সেই জন্য একদিন সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। শেষে এত রকমের চাকরী থাকতে এক জায়গায় গিয়ে তিনি বেছে নিলেন এক পেয়াদার কাজ। কিন্তু মুস্কিল হ'লো এই যে, যত সামান্য কাজই তিনি পান না কেন, কোনটাতেই লেগে থাকতে পারতেন না, শুধু তাঁর কুঁড়েমি ও আত্মাভিমানের জন্য। তা ছাড়া প্রায়ই তাঁর শরীর অসুস্থ হ'য়ে পড়ত। সেইজন্য তিনি অনবরত নানা রকম বিপদে পড়তেন। কিন্তু যখনই কোন বিপদের মধ্যে পড়তেন, তখনই তাঁর বন্ধুরা এসে সাহায্য করতেন। লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার তাঁর একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল।

এইভাবে নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে রুশোর দিন কাটতে লাগল। শেষে ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে এসে তিনি কিছুকালের জন্য স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধলেন। এই সময় রুশো প্রথম সাহিত্য-ক্ষেত্রে নামেন। তাঁর বয়স তখন তেত্রিশ বছর।

কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই রুশো ছিলেন চঞ্চলমতি। আগেই বলেছি কোন কাজই তিনি গম্ভীরভাবে বেশীদিন একসঙ্গে করতে পারতেন না। তবে তাঁর একটা গুণ ছিল, যে বিষয়টা তাঁর কাছে ভাল বলে মনে হ'তো খুব সুন্দর ক'রে সেটা লিখতে পারতেন।

সেই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর জীবনে একটা সুযোগ এলো।

ফ্রান্সের এক বিদ্বজ্জন সমাজ, মানুষের স্বভাবের ওপর সভ্যতার ফলাফল সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখবার জন্য একবার পুরস্কার ঘোষণা করলেন। রুশো এই রচনার মধ্যে যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, সভ্য মানুষের চেয়ে অসভ্য মানুষেরাই বেশী শান্তি ও বেশী সুখে বাস করছে। এমন সুকৌশলে তিনি এই কথাটি লিখলেন যে, সবাই তাঁর এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাটি পড়ে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন এবং খুশী হ'য়ে তাঁকে সেই পুরস্কারটি দিলেন। তারপর থেকেই রুশোর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে।

ফলে রাজসরকারে তিনি একটি ভাল চাকরী পেলেন। কিন্তু আগের মত এ চাকরীও তিনি বেশীদিন রাখতে পারলেন না। কেননা তিনি সর্ব্বদা অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে ঝগড়া করতেন। তাই ঝগড়াটে ও বদ্‌মেজাজী লোক বলে অল্পদিনের মধ্যেই রুশোর অখ্যাতি রটে গেল।

এখন হয়তো তোমাদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে যে, এই রকম একটা বদ লোকের কথা জেনে লাভ কি, যখন এর আগে এত ভাল ভাল বিদ্বান ও পণ্ডিত লোকদের কথা ও তাঁদের সাহিত্য আমরা পড়লুম।

সে কথার উত্তরে আমি শুধু এই বলবো যে, তাঁর চরিত্রের অন্য যাই দোষ থাকুক না কেন, তিনি এমন কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে বই লিখে গিয়েছেন যে, তার কাছে সব দোষ তুচ্ছ। কেননা, সেই লেখার প্রভাবেই একদিন পৃথিবীর বুকে ফরাসী বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল। সত্যি কথা বলতে গেলে, রুশো তাঁর লেখায় বহুদিক দিয়ে যে চিন্তাধারার অবতারণা করেছিলেন, এই বিদ্রোহের সৃষ্টি হয় তারই ফলে।

উদাহরণস্বরূপ এখানে তাঁর 'দি সোসিয়েল কনট্রাক্ট' নামক বই-খানির কথা বলা যেতে পারে। এর মধ্যে দিয়ে তিনি কি ভাবে রাজ্যশাসন করা উচিত, তার সম্বন্ধে বহু কথা বলেছিলেন। সে সময়ে

ফ্রান্স এমন অন্যায়ভাবে শাসিত ও নিপীড়িত হচ্ছিল যে, সেই বইখানি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকদের চোখ সেদিকে খুলে গেল। তারা বুঝতে পারলে, কি ভাবে সেই শাসননীতির সংস্কার হওয়া উচিত। এ ছাড়াও তিনি এমিলি নামে একখানি গল্পের বই লিখেছিলেন। বাস্তবিক, তার মধ্যে শিক্ষার সম্বন্ধে অনেক নতুন কথার তিনি উল্লেখ করেছিলেন।

সে সময় ফ্রান্সে প্রকৃত শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। এই বই বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে এক নতুন সাড়া পড়ে গেল। অজ্ঞান অন্ধকারের মধ্যে থেকে লোক যেন আলো দেখতে পেয়ে বাঁচল।

আর সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা হচ্ছে এই যে,প্রথমেসেইবইদু'খানির জন্যে দেশের লোকের কাছ থেকে তাঁকে বহু গালাগাল ও বহু লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। এমনকি কারাদণ্ডও তিনি ভোগ করেছিলেন।

এর পরও আবার তাঁকে ফ্রান্স থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল—তিনি তখন ইংল্যাণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নেন।

সেই জন্য তাঁর সমস্ত দুর্ব্বলতা ভুলে গিয়ে আজ তোমাদের তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করাই উচিত। আর সেই জন্যই বোধহয় লোকে তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে স্থান দিয়েছে।

মলেয়ার

ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার হলেন মলেয়ার। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৬২২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে।

এখানে বলে রাখা ভাল, এই নামে তিনি সর্ব্বত্র পরিচিত হ'লেও এটি কিন্তু তাঁর আসল নাম নয়। 'মলেয়ারে'র আসল নাম হ'লো জিন্ ব্যাপটিস্‌ট পোকলিন। তিনি নিজে একজন অভিনেতা ছিলেন, তাই

রঙ্গমঞ্চের জন্য একটা আলাদা নাম গ্রহণ করেছিলেন। সেকালের অধিকাংশ অভিনেতারা তাই করতেন। সেইজন্য মলেয়ার নামটি তিনি সে সময় বেছে নেন এবং এইভাবে একদিন সেই নামেই সমস্ত পৃথিবীর লোকের কাছে পরিচিত হ'য়ে পড়েন।

অন্যান্য বহু লেখকের মত মলেয়ারও লিখতে আরম্ভ করেন উকিল হবার পর। ধূলি-ধূসর প্রাচীন আইনের বই পড়তে তাঁর ভাল লাগত না, মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ ক'রে তিনি আনন্দ পেতেন। তাঁর আশে-পাশে যে সব লোকেরা থাকত তাদের রীতিনীতি আচার-ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্য ক'রে সেইগুলিকে আবার স্টেজের ওপর হুবহু অভিনয় করবার চেষ্টা করতেন এবং এইভাবেই একদিন তিনি বিখ্যাত অভিনেতা হ'য়ে উঠলেন।

তারপর আবার সেই চরিত্রগুলিকেই সরস ও জ্ঞানগর্ভ ভাষায় নাটকে লিপিবদ্ধ ক'রে তিনি বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে নিজেকে নাট্যকাররূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

কিন্তু বিশ্বসাহিত্যে এই সুনাম অর্জ্জন করবার আগে মলেয়ারকে বহু কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল এবং দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

প্রথমে নিতান্ত নগণ্যভাবে তিনি এ জীবন আরম্ভ করেছিলেন। কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে গোড়ায় তিনি প্যারিসে একটি টেনিস খেলবার মাঠ ভাড়া নেন এবং সেখানে কোন রকমে একটা স্টেজ খাড়া ক'রে অভিনয় দেখাতে শুরু করেন। মলেয়ার ছিলেন এই দলের ম্যানেজার।

তখন সময় ছিল ভারি খারাপ, তাই থিয়েটার একেবারে অচল হ'য়ে উঠলো। কিন্তু তবুও তিনি হাল ছেড়ে দিলেন না। থিয়েটার চালাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। এমন সময় একদিন ডিউক ডি গুইসি কতকগুলি পুরনো পোষাক উপহার দিয়ে তাঁদের দলকে উৎসাহিত করলেন।

এইভাবে পাঁচজনের সহানুভূতি পেয়ে কোন রকমে থিয়েটার চলতে লাগল।

কিন্তু এমন ক'রে খুব বেশী দিন চললো না। এক সময় থিয়েটারের এমন অবস্থা হ'লো যে বাতির বিল পরিশোধ করতে না পারায় মলেয়ারকে জেলে যেতে হ'লো। তাঁর বন্ধুরা তখন চাঁদা ক'রে কিছু টাকা তুলে তাঁকে মুক্ত করলেন।

অবশেষে টেনিস মাঠের প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হ'লো, তখন মলেয়ার তাঁর দল নিয়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন, ১৬৪৬ সালে।

শেক্সপীয়ারের মত অভিনয় ক'রে বেড়াতে বেড়াতে তিনিও জীবনে বহু সুখদুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। এইরূপ জীবনযাপন করতে যদিও তাঁকে খুব কষ্টভোগ করতে হয়েছিল, তবুও তার মধ্যে একটা উত্তেজনা ছিল।

এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাবার সময় তিনি ঘোড়া, গাধা ও গাড়ীর ওপর মালপত্তর বোঝাই ক'রে দীর্ঘ শোভাযাত্রা ক'রে চলে যেতেন। এইভাবে যেতে যেতে যে কোন জায়গায় তাঁরা স্টেজ খাটাতেন এবং কোন সরাইখানায় এসে বাসা বাঁধতেন। স্টেজের সামনে কিংবা পাশে সব সরু সরু বাতি জেলে আলোর ব্যবস্থা করতেন। আবার কখনো কখনো স্টেজের মাথা থেকে চার বাতির ঝাড় ঝুলিয়ে সৌখীন আলোর ব্যবস্থা করতেন। এ ছাড়া অভিনয়ের মাঝখানে দড়িতে ক'রে সেই ঝাড়টিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'তো, আর অভিনেতারা আঙ্গুলে ক'রে বাতির পলতে উস্কে দিতেন।

এই রকম অসুবিধা ভোগ করতে করতে তবে মলেয়ারের চোখে, শেক্সপীয়ারের মত, নাটকের সমস্ত দোষগুণ ক্রমশঃ ধরা পড়তে লাগল। শেষে যখন উপযুক্ত সময় এলো অর্থাৎ তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'লো, তখন তিনি নট হিসাবে খ্যাতি লাভ করলেন।

অন্যান্য যশঃপ্রার্থী অভিনেতাদের মত মলেয়ারও তখন প্যারিসে যাবার উদ্যোগ আয়োজন করতে লাগলেন। তিনি জানতেন, যশ এবং অর্থ দুই-ই সেখানে গেলে পাওয়া যাবে—যদি কোন রকমে একবার নাম করতে পারেন।

কিন্তু প্যারিসে একটা থিয়েটার খোলা মানে বহু অর্থব্যয়। অথচ তাঁর মত একটা দরিদ্র ভ্রাম্যমাণ কোম্পানীর ম্যানেজারের পক্ষে তা একেবারে অসম্ভব।

তাই তখন তাঁর পক্ষে একমাত্র যে উপায় ছিল, তা হচ্ছে কোন বড়লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা এবং তাদের অর্থ ও সহানুভূতিতে সেখানে থিয়েটার খোলা। যাহোক বহুদিন ধরে চেষ্টা করবার পর, শেষে মলেয়ারের জীবনে সেইরকম একটা সুযোগ মিলেছিল।

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজা চতুর্দ্দশ লুইয়ের ভাইয়ের সহানুভূতি লাভ করলেন। তিনি মলেয়ারকে স্বয়ং রাজার কাছে সুপারিশ ক'রে পাঠালেন।

সেই বছর তাঁর জীবনে সত্যিকার সৌভাগ্য দেখা দিল। ল্যুভরের রাজপ্রাসাদে মলেয়ার একটি থিয়েটার খুললেন। বলা বাহুল্য, তারপর থেকে তিনি আর কখনো ঘুরে বেড়াননি দল নিয়ে।

এইবার তাঁর জীবনে এক নতুন অধ্যায় সুরু হ'লো। এতদিন তিনি ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারের অভিনেতা হ'য়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন এইবার তার কৃতী ম্যানেজার ও নাট্যকার হ'য়ে আর একরকম বাধা বিপত্তি ও সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ করতে লাগলেন। তাঁকে তখন একদিকে যেমন যশহীন বহু প্রতিদ্বন্দ্বীর হিংসা দ্বেষ, মিথ্যাভাষণ, মিথ্যা বদনাম সহ্য করতে হ'লো, অন্যদিকে তেমনি আবার তাঁর দেশের লোকের মুখ থেকে অজস্র প্রশংসা শুনেও তিনি মনে মনে অত্যন্ত খুশী হ'য়ে উঠলেন। কিন্তু এসব যা হোক না কেন, এর পর আর তাঁকে

বাইরে ভ্রমণ করতে যেতে হয়নি।

মলেয়ারের বহু শত্রু ছিল। কারণ তাঁর জীবনের তীব্র অভিজ্ঞতা থেকে তিনি গভীরভাবে মানুষের মনের যে সমস্ত দুর্ব্বলতা ও অন্যায় আচরণ দেখতে পেয়েছিলেন, সেইগুলিকে তাঁর দেশের লোকের চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন অতি নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর সত্যভাষণ দ্বারা। হাসিঠাট্টার মধ্যে দিয়ে তিনি তখন যে অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন, বিশেষ ক'রে ফরাসীদের ওপর, তা একেবারে মারাত্মক। বৃথা অহঙ্কারী লোক, পেট-হাল্‌কা লোক, নির্ব্বোধ লোক, ঠগলোক—সবাইকে তিনি নির্দ্দয়ভাবে নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন করেছিলেন।

কিন্তু সমস্ত মানুষের নির্ব্বুদ্ধিতাকে নিয়ে বিদ্রূপ করা সত্ত্বেও যাদের মধ্যে সদ্‌গুণ আছে, তাদের প্রতি বরাবর তিনি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম দেখিয়েছিলেন। সত্যের প্রতি, কোন মানুষের মহানুভবতার প্রতি তিনি কখনো কোন বিদ্রূপ করেননি। প্রশংসার যোগ্য যা কিছু, সবই তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেন। আর এই সবের মধ্যে দিয়েই তিনি একদিন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের পরিচয় দিয়েছিলেন।

মলেয়ারের আবির্ভাবে ফরাসী নাট্যজগতে যে কল্যাণ সাধিত হয়েছিল তা অবর্ণনীয়। অবশ্য সেই সময় ফ্রান্সে আরও বহু খ্যাতনামা নাট্যকার ছিলেন, যাঁদের নাটক আজও বহু সম্মানের সঙ্গে অভিনীত হয়। কিন্তু তবুও যে মলেয়ারের নাটক এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, সে শুধু তখনকার নাটকগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে লেখা হ'তো বলে। তাছাড়া তাঁরা নাটক লিখতেন হোমার ও ভার্জ্জিল অবলম্বন ক'রে—অত্যন্ত চোস্ত কবিতার ভাষায়।

মলেয়ার তাঁর নাটক দিয়ে এই একঘেয়েমিটা ভেঙ্গে দিলেন। এবং সম্পূর্ণ নতুন দিকে তিনি নাটককে নিয়ে গেলেন। তিনি তাঁর নাটকের মধ্যে এমন সব লোকজনের আমদানি করলেন যাদের আমরা সচরাচর

আমাদের চারিদিকে দেখতে পাই, আর যাদের সঙ্গে দর্শকদের হৃদয়ের প্রকৃত যোগাযোগ আছে। তাছাড়া তিনি যে ভাষা নাটকে ব্যবহার করেছিলেন, সেই ভাষাই ছিল সে সময় সর্ব্বোৎকৃষ্ট—হাস্যে লাস্যে উজ্জ্বল, সতেজ ও সরস।

ফ্রান্সের লোকেরা তখন থিয়েটারে গিয়ে বিরক্ত হওয়ার চেয়ে নিজেরা মলেয়ারের নাটক পড়ে আনন্দে সময় কাটাতেন। এইভাবে মলেয়ার ফরাসী স্টেজের আমূল পরিবর্ত্তন করলেন এবং সেই ফরাসী স্টেজ থেকেই সারা ইউরোপের স্টেজে একটা বিবর্ত্তন এলো।

তাই আজও আমরা মলেয়ারের রচিত সেই সব নাটকের মধ্যে আমাদের মনের চিত্র দেখতে পাই।

ভল্‌টেয়ার

এইবার নিয়ে তৃতীয়বার আমরা ফরাসী সাহিত্যে ফিরে যাচ্ছি। এবার আর একজন বিখ্যাত ফরাসী লেখকের কথা বলবো।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্স সাহিত্যে সারা ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল। অবশ্য এর জন্য তখনকার রাজা চতুর্দ্দশ লুইয়ের বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানস্পৃহা অনেকখানি দায়ী। কারণ তিনি তখন ফ্রান্সকে সকল দিক থেকে উন্নত করবার জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন। সেইজন্য দেশের লোকেরা তাঁকে 'গ্র্যাণ্ড মনার্ক' বলতো।

চতুর্দ্দশ লুই দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছিলেন। যখন মাত্র পাঁচ বৎসরের শিশু তখন তিনি সিংহাসনে বসেন। সে ১৬৪৩ সনের কথা। তারপর তাঁর রাজত্ব শেষ হয় ১৭১৫ সালে। এই দীর্ঘ বাহাত্তর বৎসর ধরে তিনি রাজত্ব করেছিলেন এবং সেই সময়ের মধ্যে তিনি ফ্রান্সকে গৌরবের সর্ব্বোচ্চ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

যদিও তখনকার দিনের প্রচলিত প্রথা অনুসারে তিনি প্রথমেই মনোযোগ দেন রাজ্যজয়ের দিকে, তবুও একথা তিনি কখনও ভুলে যাননি যে, অন্যান্য দিকে নজর রাখাও রাজার অবশ্যকর্ত্তব্য। সেইজন্য তিনি দেশের সমস্ত গুণী ব্যক্তিদের—যাঁরা সাহিত্যে, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে বড়—উৎসাহ দিতে কখনো কার্পণ্য করেননি।

তিনি বহু রাজ্য জয় করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাদের একটাও তাঁর হাতে ছিল না। অথচ প্রজাদের মঙ্গলের জন্য দেশের অন্যান্য বিভাগে তিনি যা ক'রে গিয়েছিলেন, আজও তার গৌরব তাঁর নামকে অলঙ্কৃত ক'রে রেখেছে।

তিনি বেঁচে থাকতে থাকতেই তাঁর পুত্র ও পৌত্র মারা যান। কাজেই ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রপৌত্র, মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তাঁর সিংহাসনে বসলেন, 'পঞ্চদশ লুই' এই নাম নিয়ে।

এই রাজাও আবার রাজত্ব করলেন প্রায় ষাট বছর ধরে। এইভাবে দু'টি রাজা পর পর দীর্ঘকাল অর্থাৎ একশো তিরিশ বছরেরও বেশী ফ্রান্সে রাজত্ব করেন।

তারপর পঞ্চদশ লুইয়ের পর ষষ্ঠদশ লুই হলেন রাজা। তিনি ছিলেন অতি হতভাগ্য ; ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের এক ঘোর দুর্দ্দিনে 'গিলোটিন' নামে যূপকাষ্ঠে মৃত্যুকে বরণ করলেন।

প্রকাশ থাকে যে, এই 'গিলোটিন' যন্ত্রটি তিনিই অর্থাৎ ষষ্ঠদশ লুই-ই নিজে একদিন তৈরী করিয়েছিলেন। হায়, তখন কে জানত যে, একদিন তিনি নিজে সেই বধ-যন্ত্রে প্রাণ দেবেন।

তখনকার কালের এই ইতিহাসটুকু জানা দরকার, তা না হ'লে সাহিত্য সেই সময় কেমন ক'রে উন্নতি লাভ করলো তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যাবে না। কারণ এই সুদীর্ঘ রাজত্বকাল থেকেই ফরাসী বিদ্রোহের সূচনা। আর তার জন্যই ফ্রান্সের প্রাচীন যা কিছু ছিল,

সব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং তার প্রভাব সমস্ত ইউরোপীয় সাহিত্যে দেখা দিয়েছিল।

চতুর্দ্দশ লুই যুদ্ধ ক'রে ফ্রান্সকে দরিদ্র ও বিক্ষুব্ধ ক'রে রেখে গিয়েছিলেন। তারপর ফ্রান্সের কষ্ট দিন দিন আরও বাড়তে লাগল দুর্ব্বল রাজা পঞ্চদশ লুইয়ের হাতে পড়ে। শেষকালে একটা ভীষণ বিস্ফোরণের মত এতদিনের সঞ্চিত আক্রোশ একসঙ্গে গিয়ে জ্বলে উঠলো ষষ্ঠদশ লুইয়ের শাসন-নীতির ওপর। কাজেই যে শাসন-প্রথা তিনি তখন অবলম্বন করেছিলেন, তা কাঁচের মত ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেল।

বহু ফরাসী লেখক এই ক্ষুব্ধ ফরাসী জনতার অর্থাৎ এই বিদ্রোহীদের প্রতি একান্ত সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছেন। রুশো যে এই বিষয়ে কতখানি সাহায্য করেছিলেন তা আমরা পূর্ব্বেই বলেছি।

এইবার আমরা এমন একজনের কথা বলব যিনি তাঁর চেয়েও শক্তিমান লেখক এবং মহান্ ব্যক্তি ; তাঁর লেখনীনিঃসৃত বাণী একদিন ফরাসী দেশের সমস্ত প্রাচীন রীতিনীতিকে ধ্বংস ক'রে সেখানে এক নতুন রাজত্বের সৃষ্টি করেছিল।

আমরা দেখেছি মলেয়ার কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে দ্বিতীয় নাম নিয়েছিলেন এবং সেই নামেই সারা পৃথিবীতে খ্যাত হয়েছিলেন।

ভল্‌টেয়ারের বেলায়ও ঠিক সেই রকম হয়েছিল। তিনিও একটা দ্বিতীয় নাম নিয়েছিলেন।

ভল্‌টেয়ারের আসল নাম এরোয়েৎ। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ফ্রান্সের এক ধনীর ঘরে। তাঁর পিতা ছিলেন আইন ব্যবসায়ী। তিনি ছেলেকে নিজের ব্যবসায়ে ঢোকাবার জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেননি। যেমন অনেক সময়ে হ'য়ে থাকে, ছেলে বাপের বাধ্য হয় না, এ ক্ষেত্রেও তাই হ'লো। তা ছাড়া সব জিনিসের

বিরুদ্ধে হঠাৎ বিদ্রোহ করা ছিল ভল্‌টেয়ারের স্বভাব। তাই পিতার বিরুদ্ধে তিনি একদিন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠলেন।

ভল্‌টেয়ার সমস্ত জীবন ধরে বিদ্রোহ করেছিলেন, তখন যে সব রাজনীতি দেশে প্রচলিত ছিল তাহাদের বিরুদ্ধে। এবং তারই ফলে ফ্রান্সের চারিদিকেই উন্নতি দেখা দিয়েছিল। দেশের সম্রান্ত ব্যক্তিরা যখন নিশ্চিন্ত মনে দিনযাপন করতেন, রাজ্যের কোন কিছুতেই দৃষ্টি-পাত করতেন না, সেই সময় কিন্তু ভল্‌টেয়ার তাদের মত শান্তিতে নিদ্রা যেতে পারতেন না—অনবরত রাজ্যের সমস্ত অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন। তাই রাষ্ট্রে, সমাজে ও সাহিত্যে এই বিপ্লব আনবার সমস্ত কৃতিত্বটুকু প্রাপ্য একমাত্র ভল্‌টেয়ারের।

সে সময় ফ্রান্সের শাসন-বিভাগের কার্য্যকলাপের মধ্যে অতিমাত্রায় দুর্নীতি ও অসাধুতা দেখা দিয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ দু'টি জিনিসের কথা বলা যেতে পারে। যেমন লোকের কাছ থেকে জোর ক'রে ট্যাক্স আদায় করা হ'তো এবং যখন-তখন যাকে-তাকে বিনা বিচারে জেলে পুরে রাখা হ'তো। ভল্‌টেয়ার নির্ভীকভাবে এই সব অন্যায় ব্যাপার সকলের সামনে প্রকাশ করতে লাগলেন।

পুরোহিতেরা পর্য্যন্ত সেই সময় কুঁড়ে হ'য়ে পড়েছিলেন এবং দেশের সম্বন্ধে কোন খবরই রাখতেন না। ফলে ধর্ম্মের মধ্যেও নানা রকমের পাপ আশ্রয় নিয়েছিল।

ভল্‌টেয়ারের দৃষ্টি যখন সেদিকে গিয়ে পড়লো, তখন তিনি পুরোহিতদেরও আক্রমণ করতে ছাড়লেন না। তার কলম কখনও থামতো না এবং সর্ব্বদা চারিদিকে তাঁর দৃষ্টি সজাগ থাকত। তা ছাড়া তাঁর লেখবার ভঙ্গী ও ভাষা ছিল তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের মত। যখন যার বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধারণ করতেন, তখন তাকে ধ্বংস ক'রে দিয়ে তবে ছাড়তেন। তাঁর মত এত সরস ক'রে হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে

এই রকম দুর্নীতিমূলক জিনিসের বর্ণনা ফরাসী সাহিত্যে আর কেউ কোন দিন করতে পারেননি।

এইভাবে ভল্‌টেয়ার দেশের মধ্যে এমন সব শত্রুর সৃষ্টি করেছিলেন, যাঁদের হাতে ক্ষমতা ছিল অসীম। তাই সেই সব শত্রুদের কাছ থেকে একদিন তিনি উত্তম পুরস্কার লাভ করলেন। তারা তাঁকে প্যারিসের কারাগার 'ব্যাষ্টিলে' বন্দী ক'রে রাখলে। পরে ফরাসী বিদ্রোহের সময় উন্মত্ত জনতা এই কারাগারটিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছিল সেখান থেকে।

কিন্তু ব্যাষ্টিলে গিয়েও ভল্‌টেয়ারের সাহস কিছুমাত্র কমলো না। তখন তাঁর শত্রুরা তাঁকে ফ্রান্স থেকে তাড়িয়ে দিলেন। ভল্‌টেয়ার দেশ থেকে নির্ব্বাসিত হ'য়ে ইউরোপের নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

রুশোর মত তিনিও ইংল্যাণ্ডে গিয়ে তিন বছর বাস করেছিলেন—১৭২৬ থেকে ১৭২৯ সাল পর্য্যন্ত। এই সময় তাঁর খ্যাতি অত্যন্ত বেড়ে যায়।

তারপর তিনি লোরেনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। সেই স্থানটি তখন স্বাধীন ছিল। সেখান থেকে আবার বছর খানেকেরও বেশী তিনি বার্লিনে গিয়ে ছিলেন—প্রুসিয়ার রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেটের অতিথি হ'য়ে।

ফ্রেডারিকের অতিথি হওয়া ভল্‌টেয়ারের পক্ষে তখন একটা অসাধারণ ব্যাপার ছিল। কারণ প্রুসিয়ার রাজা বহুদিন থেকে চতুর্দ্দশ লুইয়ের পদচিহ্ন অনুসরণ করবার জন্য আগ্রহান্বিত হ'য়ে উঠেছিলেন। তাঁর মনে বিশ্বাস ছিল যে, একদিন তিনিও হয়তো প্রুসিয়াকে ফ্রান্সের মত সকলের চোখের সামনে উঁচু ক'রে ধরতে পারবেন। তাই কি উপায়ে সেই উদ্দেশ্য সফল করবেন ফ্রেডারিক যখন ভাবছিলেন, সেই

সময়ই তিনি শুনতে পেলেন ফ্রান্স থেকে নির্ব্বাসিত হয়েছেন ভল্‌টেয়ার। তখন আর এক মুহূর্ত্ত দেরী না ক'রে তিনি তাঁকে জার্ম্মানীর অতিথি হবার জন্যে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন।

ভল্‌টেয়ার এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

ফ্রেডারিক অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। কিন্তু বেশীদিন তাঁদের মধ্যে এই সৌহার্দ্দ্য রইল না। কারণ তাঁরা দু'জনে কেউই সহজে সন্তুষ্ট হবার মত লোক ছিলেন না।

ফ্রেডারিক ছিলেন যেমন উদ্ধত তেমনি অত্যাচারী। তাই ভল্‌টেয়ার যখন তাঁর মনের মত হবার ইচ্ছা করতেন, তখন তাঁকে আরও নীচ ও আরও বিশ্বাসঘাতক হ'তে হ'তো।

তা ছাড়া ভল্‌টেয়ার তাঁর আশেপাশের জার্ম্মানদের অত্যন্ত অবজ্ঞা করতেন এবং একটু সুবিধা পেলেই তাদের উপহাস করতে ছাড়তেন না। এক বছরেরও কিছু বেশী দিন বার্লিনে থাকবার পর তিনি ফ্রেডারিকের সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া করলেন। ফলে আবার তাঁকে কারাবরণ করতে হ'লো।

তারপর ভল্‌টেয়ার প্রুসিয়া ছেড়ে অন্যত্র চলে যান এবং পরে যতদিন বেঁচে ছিলেন, বার্লিনের কথা উল্লেখ ক'রে দুঃখ প্রকাশ করতেন।

কিন্তু এই সমস্ত গণ্ডগোল সত্ত্বেও ভল্‌টেয়ার তাঁর জীবনে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন, এবং চুরাশী বছর বয়স পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

জেনেভা হ্রদের তীরে 'ফারনি' বলে একটি সুন্দর স্থান ছিল, শেষ বয়সটা তিনি সেখানে পরম শান্তিতে কাটিয়ে ছিলেন। ওয়ালটার স্কটের মত তিনিও বহু লোকজনের সঙ্গে একত্রে বাস করতে ভালবাসতেন।

শেষ বয়সেও তিনি লেখা বন্ধ করেননি। 'ফারনি'র এই বাড়ী

থেকে অনবরত স্রোতের মত তাঁর লেখা বার হ'য়ে জগতের সমস্ত শিক্ষিত লোকদের শিক্ষা ও আনন্দ বর্দ্ধন করতো। বহু বই—নাটক ও ছোট ছোট পুস্তিকা তিনি সেই সময় লিখেছিলেন। বলা বাহুল্য, শেষ বয়সটা তিনি জনসাধারণের কাছ থেকে অজস্র যশ ও খ্যাতি পেয়ে পরম শান্তিতেই কাটিয়েছিলেন।

একেবারে শেষ বয়সে প্যারিসে যখন তাঁর 'আইরিনি' নাটকখানির অভিনয় হচ্ছিল, তখন তিনি সেটা দেখতে এসেছিলেন। সেই সময় তাঁর দেশের লোকেরা তাঁকে বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন। একে এই বৃদ্ধ বয়সে প্যারিস পর্য্যন্ত গাড়ীতে গিয়ে তাঁর শরীর খারাপ হ'য়ে পড়েছিল, তার ওপর আবার নাটকের অসামান্য সাফল্য দেখে তাঁর মনে এমন উত্তেজনা হ'লো যে তিনি হঠাৎ আরও বেশী অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। যদিও অল্প দিনের মধ্যে তিনি এ ধাক্কা সামলে নিলেন, তবুও কিন্তু প্যারিস থেকে যাবার মত অবস্থা তাঁর হ'লো না।

তখন অভ্যাস অনুযায়ী সেইখানেই তিনি আর একখানি বিয়োগান্ত নাটক লিখতে শুরু করলেন এবং তার কয়েক সপ্তাহ পরেই সেখানি অসমাপ্ত রেখে ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন।

এইভাবে ফ্রান্সের সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী ও বলিষ্ঠ সাহিত্যিক পরলোক গমন করেন।

কবি গ্যয়টে

বিশ্বসাহিত্যের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে এখন আমরা উনবিংশ শতকে এসেছি। এবং এই প্রথম একজন জার্ম্মান লেখকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হ'লো। জার্ম্মানী পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ জাতিগুলির মধ্যে অন্যতম —কি সাহিত্যে, কি শিল্পে, কি অন্যান্য বিষয়ে। কিন্তু এই অবস্থায়

উন্নীত হ'তে তাদের অনেক সময় লেগেছে এবং আস্তে আস্তে তাদের অগ্রসর হ'তে হয়েছে। কারণ বহুদিন পর্য্যন্ত জার্ম্মান দেশটি ছিল বহুধা-বিভক্ত এবং তার প্রতিবেশী অন্যান্য ক্ষমতাশালী জাতিগুলির আক্রমণে বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত। এই জন্য জার্ম্মানী দুর্ব্বল হ'য়ে সকলের পিছনে পড়েছিল। আর তার ভাষাও তখন ছিল অত্যন্ত শিথিল—কথ্যশব্দের সমষ্টিমাত্র। তাই কোনদিন জার্ম্মান সাহিত্য উঁচু স্তরে উঠতে পারেনি।

উনবিংশ শতকের শেষের দিকে জার্ম্মানীর অনেকগুলি রাজ্য একত্রিত হ'য়ে তবে একটা প্রবল শক্তিশালী ইউরোপীয় জাতিতে পরিণত হ'লো। তখন তারা সাহিত্যের ভাষা তৈরী করলে। তারপর একদিন ধীরে ধীরে জার্ম্মানীর সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াল।

কিন্তু এই সব হবার আগে, জার্ম্মানীতে এমন একজন লেখক জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁর প্রতিভা অন্য যে কোন বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকের চেয়ে কম ছিল না। তাঁর নাম হ'লো গ্যয়টে।

এখানে একটা জিনিস বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করতে হবে যে, সেই সময় সেই খণ্ড ও বিভক্ত জার্ম্মানীতে জন্মগ্রহণ ক'রেও তিনি একদিন জার্ম্মানীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির সম্মান লাভ করেছিলেন। অথচ তাঁর সঙ্গে বার্লিনের কোন সম্পর্ক ছিল না। আজকাল জার্ম্মানীর রাজধানী বার্লিনের নাম করতে লোকের জিভ দিয়ে জল পড়ে। সেই স্থানটি নাকি সাহিত্য ও ললিত কলার কেন্দ্র হ'য়ে উঠেছে।

গ্যয়টে জন্মগ্রহণ করেন 'ফ্রাঙ্কফোর্ট-অন্-মেইন্' নামক একটি অতি প্রাচীন ও ঐশ্বর্য্যশালী নগরে। বিখ্যাত নদী রাইনের তীরে এই নগরটি। যুবক কবি মনোহারিণী ভাষায় তাঁর সেই সুন্দর প্রাচীন বাড়ীটির বর্ণনা করেছেন বহু কবিতায় এবং বিশেষ ক'রে সেই

খেলাঘরের থিয়েটার, যেখান থেকে তাঁর মনে প্রথম নাটকীয় ভাবের উদয় হয়েছিল তার উল্লেখ করেছেন বারবার।

গ্যয়টে আইন পড়তে যান লিপ-জিগে। স্যাক্সন রাজ্যের অতি বিখ্যাত নগরী এটি। তারপর সেখান থেকে তিনি যান স্ট্রাস্ বার্গে—আলসাসে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই স্থানটি ফরাসীরা জার্ম্মানীদের কাছ থেকে কেড়ে নেয় কিন্তু আজও জার্ম্মানরা একে নিজেদের বলে মনে করে। এখানে এসে গ্যয়টে পরম উৎসাহের সঙ্গে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি যে কেবলমাত্র আইন সম্বন্ধে শিক্ষা করেন তা নয়—বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ললিতকলা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করেন।

গ্যয়টেকে ঠিকভাবে বিচার করলে একজন বিখ্যাত কবি ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। কিন্তু তাঁর নিজের মনে বিশ্বাস ছিল কবিতা তাঁর বহুমুখী প্রতিভার একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র।

যখন তাঁর বয়স মাত্র পঁচিশ বৎসর, তখন উইমার নামক একটি ছোট অর্থশালী স্টেটের ডিউকের সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব হয়। তারপর এই বন্ধুত্ব থেকেই একদিন গ্যয়টে সেই ডিউকের প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করবার জন্য সেখানে আমন্ত্রিত হন।

গ্যয়টে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উইমারের প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করলেন। তিনি কৃষিবিদ্যা, কয়লার খনি ও অন্যান্য বহু শিল্প সম্বন্ধে তখন পড়াশুনা আরম্ভ করেছিলেন। তাই তাঁর নানা রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি সেই সব বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন।

গ্যয়টে শেষ বয়স পর্য্যন্ত ছিলেন উইমারে। শুধু মধ্যে মধ্যে তিনি এদিকে ওদিকে যেতেন দেশ ভ্রমণে। এইভাবে একদিন তাঁর শেষ হাড় ক'খানি সসম্মানে সমাধি লাভ করল উইমারেরই মাটিতে।

তাছাড়া তিনি রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে কাজ করতে করতে গভীরভাবে বিজ্ঞানে মনোনিবেশ করেছিলেন। এই সময় তিনি বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই লেখেন—আলো, তার রঙ ও পৃথিবীর গঠনতত্ত্ব সম্বন্ধে। এই বই-গুলিতে তিনি যে চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছিলেন, সেগুলি আজকাল আর চলে না। সেকেলে হ'য়ে গেছে, তাই লোকে এখন ভুলে গিয়েছে তাদের নাম। তবে এখানে সেগুলির উল্লেখ করলুম এইজন্যে যে তা থেকে আমরা তাঁর কর্ম্মতৎপরতার ও বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাবো বলে।

এ ছাড়াও তিনি আরও অনেক বই লিখেছিলেন ললিতকলা ও অভিনয় সম্বন্ধে। সেই সময় তিনি সর্ব্বদা সেই সব নিয়ে আলোচনা করতেন, তাই নিত্য নতুন পরিকল্পনা তার মাথায় খেলতো।

গ্যয়টে তিরাশী বছর বেঁচে ছিলেন। এবং তিনি প্রায় ভল্‌টেয়ারের মতই বৃদ্ধ হয়েছিলেন।

গ্যয়টে গদ্য ও কবিতা সমানভাবে লিখতে পারতেন। তিনি যে উপন্যাস লিখেছিলেন আজও তা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে লোকে পড়ে এবং তিনি যে নাটক রচনা করেছিলেন আজও তা তাঁর রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হ'য়ে আছে। তাঁর গান যে কোন ভাষার গানের সঙ্গে সমান গৌরব দাবী করতে পারে। কিন্তু যে নাট্যকাব্যের জন্য তিনি আজ সর্ব্বজনপূজ্য, যার সঙ্গে আজও তাঁর নাম একেবারে জড়িয়ে আছে, সেটি হ'লো তাঁর নাটক 'ফাউস্‌ট'। বর্ত্তমান কালেও বোধ হয় এত নাম আর কেউ করতে পারেনি। ভার্জ্জিলের ইনিড অথবা দান্তের ডিভাইন কমেডির চেয়ে গ্যয়টের ফাউস্‌টের নাম বেশী প্রসিদ্ধ।

ফাউস্‌টের গল্পটা খুব পুরনো। এত পুরনো যে এই কাহিনীর অসংখ্য রূপান্তর বেরিয়েছে এবং তাদের সবগুলিই এখনও বর্ত্তমান।

কিন্তু তাদের সবগুলোই যে ভাল সাহিত্য হয়েছে একথা বলা যায় না। অবশ্য ফাউস্‌ট গল্পের মূল অর্থটা সকলেরই এক।

ফাউস্‌ট লোকটি খুব পণ্ডিত এবং প্রায় একজন জাদুগরের মত ছিলেন। তিনি একবার তাঁর যৌবন ফিরে পাবার জন্য আত্মাকে বিক্রী ক'রে দিলেন, মেফিস্‌টোফিলিস্‌ নামে এক সয়তানের চরের কাছে।

ফাউস্‌ট ফিরে পেলেন তাঁর যৌবন। কিন্তু মেফিস্‌টোফিলিস্‌ একটা সময় নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছিল, যখন এসে সে ফাউস্‌টের আত্মাকে নিয়ে যাবে ধ্বংসের পথে। এবং এক সময় এসে সে সেই দাবীই করলে।

অতি সাধারণ এই গল্পটি শুধু গ্যয়টের রচনার গুণে অসাধারণ কাব্য হ'য়ে উঠেছে। তোমরা শুনলে আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে যে, এই কবিতাটি রচনা করতে তাঁর জীবনের সমস্ত ভাগ সময় ব্যয়িত হয়েছিল। তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা, সমস্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষা এই কবিতাটির মধ্যে সংগ্রথিত করেছেন।

তাই ফাউস্‌ট আর এখন একজন মানুষ নন—তিনি সমগ্র পৃথিবীর মানুষে পরিণত হয়েছেন—এবং তাঁর মধ্যে সকল মানুষের, সকল রকমের সুখদুঃখ পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছে। আর ঠিক সেই ভাবেই আবার মেফিস্‌টোফিলিস্‌ হ'য়ে উঠেছে সমগ্র মনুষ্যজাতির অসৎ আত্মা—যে সর্ব্বদা বিশ্বের মানুষকে সর্ব্বনাশের পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

এই কবিতাটিকে নাটক বলা হয়, কিন্তু এত বিরাট ও এত ভয়ঙ্কর এর দৃশ্যপটগুলি যে, ষ্টেজে অভিনয় করার পক্ষে একেবারে অচল।

গ্যয়টের এই কবিতাটি সমগ্র জার্ম্মান জাতির শ্রেষ্ঠ রত্ন ও গর্ব্বস্বরূপ হ'য়ে মাথা উঁচু ক'রে আজও দাঁড়িয়ে আছে। এবং সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, গ্যয়টে একাই এর স্রষ্টিকর্ত্তা। একমাত্র তাঁর নিজের বিস্ময়কর প্রতিভা থেকে উদ্ভূত হয়েছে এই বিরাট পরিকল্পনা!

ব্যাল্‌জ্যাক

এইবার আমরা ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক অনর ডি ব্যাল্‌জ্যাকের কথা বলব। সমস্ত দেশের, সমস্ত যুগের গল্প লেখকদের মধ্যে ব্যাল্‌জ্যাকের মত এ রকম অদ্ভুত চরিত্রের লোক আর দেখা যায় না।

ফ্রান্সের এক প্রাচীন শহর ত্যর'এ তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে। ঠিক যখন নেপোলিয়নের খ্যাতি দ্রুত বেড়ে চলেছে, সেই সময়।

পূর্ব্ববর্ণিত অন্যান্য সাহিত্যিকদের মত ব্যাল্‌জ্যাকও প্রথমে আইন পড়তে গিয়েছিলেন। এবং তাঁদেরই মত আবার তিনি না-পড়ে ফিরে এসেছিলেন। কারণ তাঁর মেজাজ ছিল সম্পূর্ণ আইন পড়ার বিরুদ্ধে কিন্তু তাঁর পিতা অত্যন্ত কড়া লোক ছিলেন; তিনি জেদ ধরলেন, যেমন ক'রে হোক তাকে আইন পড়াবেনই। এদিকে ছেলেও তেমনি একগুঁয়ে; বললে, কিছুতেই পড়বো না। তখন ব্যাল্‌জ্যাকের বয়স একুশ বছর। স্বাধীনতার নব চেতনায় তাঁর সমস্ত মন পরিপূর্ণ।

ছেলেকে জব্দ করার জন্য ব্যাল্‌জ্যাকের পিতা তার খরচাপত্তর সব বন্ধ ক'রে দিলেন। তখন ব্যাল্‌জ্যাক কপর্দ্দকহীন হ'য়ে প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

এই ভাবে দু'তিন বছর প্রায় অনাহারে সেই তরুণ লেখকটিকে কাটাতে হয়েছিল, অতি জঘন্য এক খুপরী ঘরে। কিন্তু এ কষ্ট বেশী দিন সহ্য করতে না পেরে, তিনি শেষে মরীয়া হ'য়ে লিখতে আরম্ভ করলেন। যেমন ক'রে হোক টাকা উপার্জ্জন করবেনই এই হ'লো তাঁর প্রতিজ্ঞা।

ব্যাল্‌জ্যাকের একটি বোন ছিল, তাঁর নাম লরা। যেমনি অবস্থাপন্ন তেমনি তাঁর অন্তরটাও ছিল খুব ভাল। তিনি সর্ব্বদা ভাইকে সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ব্যাল্‌জ্যাক তাঁর কাছ থেকে

টাকা নিতে মোটে রাজী হলেন না। টাকা চাইতে বা অন্যের কাছ থেকে ধার করতে তাঁর যে কোন আপত্তি ছিল তা নয়, তবে একরোখা মেজাজের জন্য কখনই কারো কোন সৎপরামর্শ তাঁর ভাল লাগত না। ফলে তাঁকে বহু কষ্ট সহ্য করতে হ'তো। তা না হ'লে তাঁর জীবন হয়তো আরো সহজ হ'তো এবং আরো সুখে তিনি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারতেন।

প্রসিদ্ধ স্কচ্ লেখক স্যার ওয়াল্টার স্কটের ন্যায় ব্যল্‌জ্যাকেরও মনে একটা ধারণা ছিল যে, তিনি ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করতে পারবেন। কিন্তু ব্যবসায়ে নেমেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, সে পথে যাওয়া তাঁর ভুল হয়েছে। কেননা প্রথমেই তিনি ছাপার টাইপের ব্যবসা করতে গিয়ে সমস্ত টাকা তাতে লোকসান দেন। অবশ্য স্কটের মত তিনি নিজেকে একেবারে ধ্বংস ক'রে ফেলেননি, তবে ব্যবসার জন্যে বহু ঋণ করেছিলেন।

যদিও ব্যবসায়ে উন্নতি করবার জন্য তিনি জীবনে বহু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। তাঁর পুরাতন ঋণ যেই শোধ হ'তো, অমনি তিনি আবার নতুন ঋণ গ্রহণ করতেন।

এইভাবে বহু সময় ও ক্ষমতার তিনি অপব্যয় করেছিলেন ব্যবসা করতে গিয়ে। এই সময়টা যদি তিনি জীবনের প্রকৃত ব্যবসায়ে নামতেন অর্থাৎ সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হতেন তাহ'লে হয়তো বহু পূর্ব্বেই যশ ও অর্থ দুই-ই করতে পারতেন। যা হোক, কিছুদিন এইভাবে কাটাবার পর তিনি প্রকৃত সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ করলেন—প্রায় ত্রিশ বছর বয়সে।

ব্যল্‌জ্যাকের একটা গুণ ছিল তিনি যখন মনযোগ দিয়ে লিখতে আরম্ভ করতেন, তখন আর কেউ তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারতো না। কাজ করবার শক্তি ছিল তাঁর অসাধারণ।

তিনি একসঙ্গে ষোল ঘণ্টা লিখতে পারতেন এবং এইভাবে কয়েক

সপ্তাহের মধ্যে একখানি পুস্তক রচনা সমাপ্ত করতেন। একবার তাঁর লেখার প্রেরণা এলে আর কিছুতেই তিনি ক্লান্তিবোধ করতেন না। কাজে কাজেই তিনি হুড় হুড় ক'রে লিখতে লাগলেন—নাটক, গল্প, উপন্যাস, খবরের কাগজের প্রবন্ধ, ছোট ছোট পুস্তিকা ইত্যাদি যখন যা তাঁর মনে আসতো।

এত তাড়াতাড়ি লেখার জন্য তাঁর অধিকাংশ বই হয়তো সুনাম অর্জ্জন করতে পারেনি। কিন্তু তাঁর কয়েকটি উপন্যাস সত্যিই উৎকর্ষের চরম নিদর্শন। এই উপন্যাসগুলিকে লিখতে তাঁকে বহু পরিশ্রম ও বহু চিন্তা করতে হয়েছিল। এই বইগুলিকে বলা হয় 'হিউমেন্ কমেডি'।

দান্তে তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'ডিভাইন কমেডি'তে মানুষকে এঁকেছেন এই পৃথিবীর বাইরের জগতের লোক ক'রে। কিন্তু ব্যল্‌জ্যাক তাঁর এই বিখ্যাত উপন্যাসগুলির মধ্যে দেখিয়েছেন মানুষকে এই দৈনন্দিন পৃথিবীর লোক বলে। যদিও সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে তিনি এর বর্ণনা করেছেন, তথাপি কি রচনানৈপুণ্যে, কি কল্পনার প্রাবল্যে এর কোন অংশই দান্তের চেয়ে নিকৃষ্ট হয়নি। কিন্তু দান্তের মত তিনিও রচনার মধ্যে হাস্যরসের সৃষ্টি করেননি। ব্যল্‌জ্যাকের কমেডি ছিল অত্যন্ত করুণ ও হৃদয়বিদারক—দান্তের কমেডির প্রথম খণ্ডের মত। এ থেকে বোঝা যায় যে, তাঁদের দুজনেরই মধ্যে ছিল একটা বিরাট মন ও বিরাট কল্পনা, তা না হ'লে কখনো এত বড় জিনিস মানুষ ধারণা করতে পারে না।

ব্যল্‌জ্যাক শুধু মানুষের জীবনের সুখ দুঃখ নিয়ে গল্প লিখতেন, বিশেষ ক'রে যে সব মানুষকে তিনি জানতেন ও চিনতেন। তাই তাঁর অধিকাংশ গল্পের মধ্যে শুধু প্যারিসের লোকজনের উল্লেখ আছে। তিনি একসঙ্গে দেখিয়েছিলেন সেখানকার ভদ্রসমাজের উজ্জ্বলতা, অভদ্র ও ইতর সমাজের নগ্ন কদর্য্যতা এবং সাধারণ মানুষের সততা ও সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা। তাছাড়া প্যারিসবাসীদের জীবনের সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয়

ছিল। কারণ তিনি নিজে সেখানে মানুষ হয়েছিলেন এবং সেখানকার সব অবস্থাই জানতেন।

এই ভাবে তাঁর সাহিত্য থেকেই আমরা প্যারিসবাসীদের জীবনের উজ্জ্বলতম চিত্র ও তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার আশ্চর্য্য বিকাশ দেখতে পেয়েছি।

তাঁর সব পরিকল্পনা সফল হবার আগেই তিনি মারা যান। কিন্তু তবুও সেদিন তিনি তাঁর পেছনে সাহিত্যের যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ উপাদান রেখে গিয়েছিলেন, তারই সহায়তায় ভবিষ্যতে বহু উৎকৃষ্ট উপন্যাস গড়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল।

ব্যল্‌জ্যাক কুড়ি বছরের মধ্যে কমপক্ষে পঁচাশীখানা উপন্যাস লিখেছিলেন। কাজেই এটা খুব স্বাভাবিক যে, তার মধ্যে কিছু বাজে ও কিছু নিকৃষ্ট হবে। তবে এর মধ্যে অনেকগুলি বই-ই তাঁর লেখার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এবং বিশ্বসাহিত্যে এইগুলি যে বহুদিন বেঁচে থাকবে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

টল্‌স্টয়

এইবার আমরা রাশিয়ায় এসেছি। বিশ্বসাহিত্যে আমাদের দীর্ঘভ্রমণ প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। এখন আমরা দেখবো কেমন ক'রে সকলের পশ্চাতে থেকে রাশিয়া ধীরে ধীরে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করলো।

প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতকের শেষভাগে রাশিয়ায় সত্যিকারের সাহিত্য গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল। তার ফসল দেরীতে শুরু হ'লেও ফলেছিল উৎকৃষ্ট ও অপরূপ। রাশিয়ার সমস্ত লেখকদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হলেন কাউন্ট লিয়ো টলস্টয়।

পূর্ব্বে আমরা বহু অসাধারণ ব্যক্তির সম্বন্ধে বলেছি সত্য, কিন্তু চিন্তাশীলতায় ও চরিত্রের দৃঢ়তায় তাঁদের কেউ টলস্টয়ের মত অভিনব ও অনন্যসাধারণ ছিলেন না। সব দিক দিয়ে দেখতে গেলে টলস্টয় ছিলেন অতুলনীয়। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, তাঁর নিজের জীবনের সঙ্গে সাহিত্য-জীবনের একেবারে মিল ছিল না।

তিনি নিজে ভালবাসতেন যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু রমণীয়, কিন্তু তাঁকে দেখতে এত কুৎসিত ছিল যে, ছেলেবেলায় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখে তিনি লজ্জিত হ'য়ে পড়তেন।

তাছাড়া তিনি অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। যুদ্ধ, হিংসা, দ্বেষ, মারামারি একেবারে ভালবাসতেন না। কিন্তু তবুও যুদ্ধ হ'য়ে পড়েছিল তাঁর পেশা। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন একজন সেনানী। ক্রিমিয়া যুদ্ধের বীভৎসতা তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন।

টলস্টয় নিজে ছিলেন জমিদার। কোন এক ধনী, অলস ও স্বার্থপর বংশে তাঁর জন্ম হয়। রাশিয়ায় তখন এই শ্রেণীর জমিদার বিস্তর ছিল। তাঁরা খুব সহজ ভাবেই সে সময় গরীব প্রজাদের ওপর উৎপীড়ন ও অত্যাচার করতেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে জন্মেও টলস্টয়ের অন্তর এই যে দরিদ্র ও উৎপীড়িতদের জন্য সর্ব্বদা কাঁদতো এইটেই আশ্চর্য্য। তিনি ছিলেন তাঁদের সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন।

টলস্টয় ছিলেন স্বাবলম্বী পুরুষ। শেষ জীবনে নিজের হাতে সব কাজ ক'রে তিনি আনন্দ পেতেন। তিনি চাষ করতেন, এমনকি জুতো তৈরী করতে পারতেন। কিন্তু হায়! বিধাতার নির্দ্দেশে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন আলস্যে জীবনযাপন করতে। এই সময় পরিশ্রমবিমুখ হ'য়ে বসে বসে বই লিখতে হ'তো।

এই রকম আরো অনেক বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ টলস্টয়ের চরিত্রে প্রকাশ পেতো। তাই সমস্ত বিখ্যাত রাশিয়ান লেখকদের মধ্যে তিনি

ছিলেন অদ্ভুত প্রকৃতির।

সত্য কথা বলতে গেলে, সেই সময়ে সেখানে টলস্টয়ের জন্মানো ঠিক হয়নি। তিনি জন্মেছিলেন ভুল সময়ে, ও ভুল স্থানে। তাই অত্যন্ত কষ্ট সহ্য ক'রে তিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে নিজেকে কোনরকমে মানিয়ে নিয়েছিলেন।

কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থাগুলি তাঁর কাছে অসহ্য বলে মনে হ'তে লাগল। তখন তিনি বিদ্রোহ করেন সমাজের বিরুদ্ধে। তিনি নিজের যৌবনের অভিজ্ঞতার কথা অতি সুন্দর ভাবে একখানি বইয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই বইখানির সঙ্গে রুশোর কন্‌ফেশনের খুব সাদৃশ্য আছে। টলস্টয় এই বইখানির খুব প্রশংসা করতেন এবং তাঁর লেখার অনুকরণও করেছিলেন প্রথম যুগে।

Childhood, Boyhood and Youth নামক বইয়ে টলস্টয় নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করেছেন তাঁর পিতার জমিদারীর বিষয়। এই স্থানটি হ'লো রাশিয়ার দক্ষিণে টুলা নামক একটি অতি বিখ্যাত শহরের কাছে।

বালক টলস্টয়, যার মধ্যে এতবড় প্রতিভা সুপ্ত ছিল, মোটেই কিন্তু চতুর ছিলেন না। তিনি ছিলেন নিতান্ত নিরীহ ও উদাসীন প্রকৃতির। তাঁর শিক্ষক ও গুরুজনরা কেউই জানতেন না, কি গভীর চিন্তা দিনরাত তাঁর মন অধিকার ক'রে থাকতো।

পরে যখন তিনি কাজান ইউনিভারসিটিতে পড়তে যান তখন সেখানকার ছাত্রদের উপযুক্ত বিশেষ পোষাকপরিচ্ছদ পরে সেখানে ঘুরে বেড়াতেন। তাছাড়া তিনি বাবুয়ানি ক'রে এমন আলস্যে দিন কাটাতেন যে, তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সকলের চেয়ে নিকৃষ্ট ছাত্র। এ কথাও তিনি লিখেছেন তাঁর বইয়ে।

তখনকার দিনে সমস্ত অভিজাত-বংশীয় যুবককে যুদ্ধে যেতে

হ'তো। তাই যখন তিনি সৈন্য বিভাগে ঢুকলেন, তখন এমন উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্দাম হ'য়ে উঠলেন যে, তখনকার অন্য সাধারণ ধনী সরকারী কর্ম্মচারীর সঙ্গে তাঁর আর কোন প্রভেদ রইল না।

এইভাবে তাঁর জীবন কতদিন চলতো জানি না। কিন্তু যুদ্ধে গিয়ে নিজের চোখে তার বীভৎসতা দেখে তিনি শিউরে উঠলেন। এবং সেইদিন থেকে টলস্টয়ের জীবনে এল পরিবর্ত্তন। যে সমস্ত কল্পনা তাঁর মনে চঞ্চল হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ তা যেন স্থির হ'য়ে গেল। আর তারই সঙ্গে তাঁর স্বভাব গেল একেবারে বদলে।

তিনি রাজধানীর সমস্ত সুখ ও বিলাস পরিত্যাগ ক'রে তখন দক্ষিণ রাশিয়ায় নিজের স্টেটে ফিরে গেলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে উপবাস-ক্লিষ্ট চাষাদের অবস্থা দেখে এত বিচলিত হ'য়ে পড়লেন যে, রাশিয়ার লক্ষ লক্ষ অসহায় দরিদ্রদের জন্য তাঁর অন্তর আবার কেঁদে উঠলো। সেইদিন থেকে টলস্টয়ের জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য হ'লো দেশবাসীর সাহায্য করা।

তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে তখন বাইবেল পড়তে শুরু করলেন এবং যখন দেখলেন যে, তাতে লেখা আছে, জনসেবাই মানুষের ধর্ম্ম, তখন তিনি সেখানে একটি স্কুল স্থাপন করলেন, আর নিজে পুস্তক রচনা ক'রে দরিদ্র নিরক্ষর চাষাদের লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন।

তখন দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ছিলেন রাশিয়ার জার। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এক হুকুম জাহির করলেন যে, রাশিয়ায় যেখানে যত দাস আছে তাদের মুক্ত ক'রে দিতে হবে।

টলস্টয় জারের এই আদেশ শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলেন এবং যাতে তাড়াতাড়ি এই কার্য্য সম্পন্ন হয়, তার জন্য নিজে উঠে পড়ে লাগলেন।

তারপর এই সব ভোগ-ঐশ্বর্য্য থেকে বিদায় নিয়ে বৃদ্ধ বয়সে টলস্টয়

চাষী হলেন। চাষার পোষাক পরে চাষীদের মধ্যে গিয়ে তিনি বাস করতে লাগলেন। তিনি জুতো সেলাই করতে পারতেন এবং মুচীর মত চাষীদের জুতো সব নিজেব হাতে তৈরী ক'রে দিতেন। এই সব কাজ করতে করতে তিনি কেবল মনে ভাবতেন যে, ভগবান যীশু খৃষ্টের আদেশ প্রতিপালন করছেন।

কিন্তু চাষীদের উন্নতির জন্য নিজের কল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে টলস্টয় অত্যন্ত বিপদের মধ্যে পড়লেন। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে ঠাট্টা করতে লাগলেন এবং তাঁর এই পাগলামি দেখে সবাই অবাক হ'য়ে গেলেন। কিন্তু যথাসময়ে তিনি সেই সমস্ত কাটিয়ে উঠলেন। তারপর থেকে যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন, হাজাব হাজাব লোকের কাছ থেকে দেবতাব মত ভক্তি ও শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। আর কেবল যে রাশিয়ার লোকদেব কাছ থেকে পেয়েছিলেন তা নয়—পৃথিবীর সমস্ত লোকের কাছ থেকে এই ভাবে তিনি যে পুবস্কাব লাভ করেছিলেন, তার মূল্য ছিল টলস্টয়েব কাছে সব চেয়ে বেশী।

এই সমস্ত কাজের মধ্যে থেকেও কিন্তু টলস্টয় তাঁর জীবনের যে আর একটি মহৎ উদ্দেশ্য ছিল তাব কথা একবারও ভোলেননি। তাই শেষ বয়সে তিনি ধীর ও স্থিরভাবে পুস্তক রচনা শুরু করলেন।

এইভাবে তাঁর নাম একদিন সারা ইউবোপে ছড়িয়ে পড়লো এবং তিনি সে সময় ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক বলে খ্যাতি লাভ করলেন।

টলস্টয় তাঁর প্রত্যেক রচনার মধ্য দিয়ে দেখাতে লাগলেন একদিকে ধনীর সুখ ঐশ্বর্য্য ও বিলাসজনিত অপকারিতা, অপর দিকে তেমনি অতি সাধারণ ও দরিদ্র লোকদের সততা এবং মহানুভবতা। এই দুই জীবনের সঙ্গেই ছিল তাঁর নিজের আত্মার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তাই তাঁর নিখুঁত বর্ণনা দেখে সমস্ত পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে গেল।

তাঁর সব চেয়ে সুন্দর ও বৃহদাকার পুস্তকের নাম 'ওয়ার এণ্ড পিস' —তার মধ্যে আছে নেপোলিয়ান যখন ১৮১২ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া আক্রমণ করেন, তার সম্বন্ধে এক দীর্ঘ গল্প। কিন্তু এ ছাড়াও তাতে আরো অনেক বড় জিনিস ছিল—যেমন রাশিয়ানদের রীতিনীতি, তাদের সেই সময়কার জীবনযাত্রা প্রণালী এবং যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি নিদারুণ ঘৃণার এক বিরাট চিত্র।

এক কথায় বলতে গেলে দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' ও ব্যল্‌জ্যাকের 'হিউমেন কমেডি'র মত টলস্টয়ের এই 'ওয়ার এণ্ড পিস্' হ'লো মনুষ্যজীবনের এক বিরাট ও সুন্দর প্রতিকৃতি। সেইজন্য আজও এই বইখানি বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন হিসাবে সম্মান পায়।

শেষ